ত্রিভঙ্গ রায়

প্রকাশক

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা

১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং হইতে
বলাই সেন দ্বারা প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
শ্রীকৃষ্ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৫৯, আপার চিৎপুর রোড,
কলিকাতা
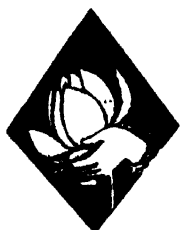
উপহার

যাঁদের আশীর্ব্বাদ ও উপদেশ ‘গৌতম-বুদ্ধ’ রচনাকালে আমার পাথেয় ছিল, প্রথমে তাঁদের কাছেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্চি। পরামর্শ দিয়ে যে সব বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করেচেন তাঁদের ভালবাসা ভুলে যাবার নয়।

ছোট্ট ছোট্ট ভাই আর বোনদের হাতে আমার গৌতম-বুদ্ধ পৌঁছে দিয়ে এইটুকুই আশা করি যেন তাদের টুকটুকে কচি মুখগুলো আনন্দে আরও নির্ম্মল হয়ে ওঠে, দেবতা বুদ্ধের চরণতলে পুষ্পাঞ্জলির মতো।

কলিকাতা
মহালয়া, ১৩৪৪

ত্রিভঙ্গ রায়

এই বইখানির সমস্ত ছবি ও প্রচ্ছদপট গ্রন্থাকারের নিজের আঁকা

প্রকাশক

সূচীপত্র

এক

পরিচয়

কাশী সহরের একশো মাইল উত্তর-পূর্ব্বে হিমালয়ের গা ঘেঁসে বয়ে চলেচে রোহিণী নদী। এরই তীরে কপিলবস্তু ছোট্ট একটি রাজ্য। অনেক আগে এখানে শাক্য-বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন ইক্ষ্বাকু-বংশের ক্ষত্রিয় বলে।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এখানে শাক্য-বংশের রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন।

যেমন ভালো রাজা প্রজাদেরও তেমনি সুখের সীমা ছিল না। তাদের ছিল—দেহভরা স্বাস্থ্য, বুকভরা স্ফূর্ত্তি, মুখভরা হাসি আর গৃহভরা ধনজন। রাজার সুশাসনে কোথাও এতটুকু অশান্তি ছিল না। সবাই বলতো রামরাজত্ব।

এমন ধনে-জনে ভরা সুখের রাজত্ব, তবু রাজা-রাণীর মুখে

একটা বিষাদের কালো ছায়া। বুড়ো বয়সে কার হাতে রাজ্যভার দিয়ে ধর্ম্মকর্ম্মে মন দেবেন—তাই ভাবতেন। রাজা ছিলেন অপুত্রক।

অনেক পূজো-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম করলেন—দানধ্যানের তো কথাই ছিল না। অনেক করেও কিছু হলো না। রাজা-রাণী পুত্রমুখ দেখবার আশায় হতাশ হলেন।
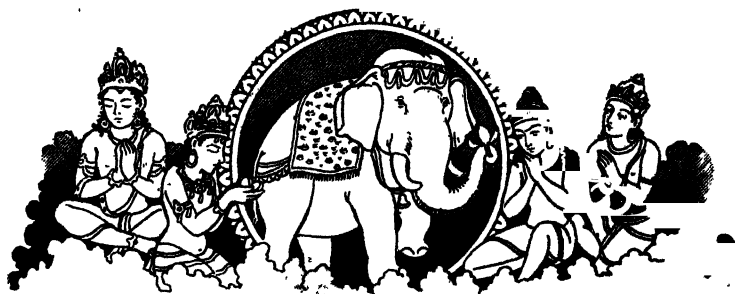
দুই
স্বপ্ন

শরতের রাত্রি।

বর্ষার জলে ধোয়া-মোছা পরিষ্কার আকাশ। চাঁদের হাসিতে ভরে গেছে সেই নীল আকাশ। আর তারই গায়ে তারাগুলো হীরের টুক্‌রোর মত মিট্‌মিট্ করে জ্বলচে। মাঝে মাঝে পেঁজা তূলোর মত ভেসে বেড়াচ্চে জ্যোৎস্না-মাখানো দুএকখানা হাল্কা মেঘ। শিউলিফুলের গন্ধে ভরা ফুর্‌ফুরে হাওয়া মনপ্রাণ মাতিয়ে তুলচে। চারদিক্ নিঝুম—খালি মাঝে মাঝে দুএকটা রাতচরা পাখীর আওয়াজ শোনা যায়।

সোনার পালঙ্কে পাটরাণী মায়াদেবী অকাতরে ঘুমুচ্চেন। এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে রাণী হঠাৎ চমকে উঠলেন। দেখলেন—যেন আকাশ থেকে একটা উজ্জ্বল তারা খসে পড়লো,—দেখতে দেখতে তারাটি এক সুন্দর সাদা হাতীর আকার ধরলে। আলোকরেখার মত তার

দাঁতগুলি—আশ্চর্য্য সুন্দর। সেই হাতীটা যেন তাঁর ডান পাশ দিয়ে পেটের মধ্যে প্রবেশ করচে। ঘুম ভেঙে গেলেও রাণীর মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠলো—কেন যে, তা তিনি জানতে পারলেন না।

পরদিন রাজ্যের ভাল ভাল জ্যোতিষীদের আনা হলো—স্বপ্নের বিচার করতে।

তাঁরা বললেন—"স্বপ্নের ফল শুভ। রাণী-মা এক পুত্র প্রসব করবেন—সেই পুত্র একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী হবেন, তাঁর জ্ঞানের প্রভাবে জগতের দুঃখ দূর হবে। যদি রাজত্ব করেন, তো রাজচক্রবর্ত্তী হবেন। তবে সে আশা কম।"

যাই হোক, পুত্রমুখ দেখবার আশায় রাজার মন আনন্দে ভরে উঠলো। রাজা ভাবলেন,—ছেলে যাতে সংসার ছেড়ে না যেতে পারে, তার রীতিমত ব্যবস্থা করলেই হবে।

অল্পদিন পরেই রাজবাড়ীতে আনন্দের রোল উঠলো। দাসীরা এসে হাসিমুখে খবর দিলে, মহারাজ শীগ্‌গির পুত্রমুখ দেখবেন।

তিন

জন্ম

এরি মধ্যে একদিন রাণীর ইচ্ছে হলো, বাপের বাড়ী যাবেন। লোক-লস্কর দাস-দাসী সঙ্গে নিয়ে মণিমুক্তা-খচিত রথে চড়ে রাণী চললেন পিত্রালয়ে।

পথেই লুম্বিনীর মনোহর উদ্যান। তার শোভা দেখে রাণী মুগ্ধ হলেন। রথ হতে নেমে একটু বেড়াতে লাগলেন সেই বাগানের মধ্যে।

কী সুন্দর সেই বাগান! সবুজ পাতায় ভরা গাছ—গাছে গাছে সাদা লাল হল্‌দে কত রঙ-বেরঙের ফুল! ফুলে ফুলে গুন্‌গুন্ করে উড়ে বেড়াচ্চে ভ্রমরের দল। কচি সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ—কে যেন নরম মখমল পেতে দিয়েচে। তারি বুক চিরে চলে গেচে ধব্‌ধবে সরু রাস্তা—অনেক দূরে। মাঝখানে বড় এক দীঘি।

কী স্বচ্ছ নির্ম্মল তার জল,—ঠিক যেন ভালো মানুষের মন! আবার তারই মাঝে মাঝে খুকুমণির হাসির মত ফুটে আছে শত শত শতদল। যুঁই চামেলি বেলা গন্ধরাজ পারিজাত প্রভৃতি ফুলের সুবাস গায়ে মেখে ধীরে ধীরে বাতাস বইচে। কোকিল পাপিয়া দোয়েলের মিষ্টি সুরে বীণার সুরকেও হার মানতে হচ্চে।

বড় আনন্দেই রাণী বাগানের মধ্যে বেড়াচ্চেন। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়লেন রঙিন ফুলে ভরা এক বড় গাছের তলায়। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে ম্লান হাতে ডাল ধরে মায়াদেবী তার ছায়ায় দাঁড়ালেন। ঠিক এই সময়ে মায়াদেবীর একটি ছেলে হলো। ছেলে তো নয়, যেন দেবপুত্র।

সঙ্গের লোকেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে মহানন্দে ধূমধাম করে ফিরিয়ে নিয়ে এলো রাণীমাকে,—আর তাদের অনেক দিনের চাওয়া ছোট্ট রাজকুমারকে।

ছেলে তো নয়, যেন দেবপুত্র (পৃঃ ৬)

চার

ভবিষ্যদ্‌বাণী

কপিলবস্তু নগরে আজ উৎসবের স্রোত চলেচে। অগুরু-চন্দনের জলে ধোয়া রাজপথে নানা রঙের ফুল পাতা মালা দিয়ে শত শত তোরণ তৈরী হয়েচে। তোরণে তোরণে পতাকার সারি আর মঙ্গলকলস শোভা পাচ্চে। দুয়ারে দুয়ারে রোশনচৌকি সুর ধরেচে। পথে পথে কত রকমের ক্রীড়া-কৌতুক চলেচে।

কোথাও বাজিকর কৌশল দেখাচ্চে; কোথাও তলোয়ারের খেলা দেখে লোকের চমক লেগে যাচ্চে; কোথাও বা ভালো ভালো গায়ক

বীণার সুরে সুর মিলিয়ে লোকের মন মুগ্ধ করচে। আবার কোথাও স্বর্গের অপ্সরাদের মত নর্ত্তকীরা বাজনার তালে তালে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে নাচচে।

দীনদুঃখী যে যেখানে ছিল, এসে পেট ভরে খেয়ে, আর আঁচল ভরে নিয়ে, দুহাত তুলে নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চে—রাজার আদেশে দান-ভাণ্ডার খোলা হয়েচে।

নবকুমারকে দেখবার জন্যে দলে দলে হাজারে হাজারে প্রজারা রাজবাড়ীতে আসতে লাগলো। দেশবিদেশ হতে কত লোকজন, কত রাজরাজড়া, কত মুনিঋষি এলেন রাজকুমারকে দেখতে।

শুভদিনে কুমারের নাম রাখা হলো সর্ব্বার্থসিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ। দর্শকদের মধ্যে এসেছিলেন খুব বুড়ো এক ঋষি। তাঁর নাম অসিত-দেবল। তিনি এত বুড়ো হয়েছিলেন যে, পৃথিবীর কোন শব্দই তাঁর কানে যেত না। কিন্তু তা হলে কি হবে,—তিনি ছিলেন খুব জ্ঞানী আর ভবিষ্যদ্বক্তা।

এই বুড়ো ঋষিকে রাজা-রাণী প্রণাম করলেন। নবকুমারকে দেখে তো ঋষি অবাক্! খানিকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হলো না। তারপরে যখন রাণীমা তাঁর পায়ের ধূলো কুমারের মাথায় দিতে যাচ্চেন—ঋষি অমনি তাঁর হাত ধরে ফেলে শিশুকে বুকে তুলে নিলেন। পরে বললেন—"রাণীমা, তোমার ছেলের মাথায় কারুর পায়ের ধূলো দিতে হবে না—সারা জগতের লোক ওঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হবে। এঁর শরীরে বত্রিশটি সুলক্ষণ রয়েচে—এগুলি মহাপুরুষের লক্ষণ। এগুলি থাকলে মানুষ দেবতারও

বড় হয়—তোমার ছেলে দেবতাদেরও প্রণম্য। ইনি স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বত্যাগী বুদ্ধ।"

বলতে বলতে বুড়ো ঋষির কোটরগত চোখ জলে ভরে এলো। মনে মনে বললেন—"বুড়ো হয়েছি, এখন আমার মরণের সময় হয়েচে, কিন্তু তোমায় দেখে আরও বাঁচবার ইচ্ছে হচ্চে—কী করে জগতের দুঃখ দূর কর, দেখবার জন্যে।"

মনে মনে এই দেবশিশুকে প্রণাম করে ঋষি চলে গেলেন।

কিন্তু সুখের পাশে দুঃখ আর দুঃখের পাশে সুখ থাকাটাই হলো সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। তাই এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে, সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তম দিনের ভোরে, পূব আকাশে রঙিন আলো ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মায়াদেবী রাজার হাতে সিদ্ধার্থকে দিয়ে স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

সুখের সাগরে দুঃখের ঢেউ উঠলো। মনের কষ্ট মনে চেপে রাজা ছোটরাণী মহাপ্রজাবতী গৌতমীর হাতে শিশুর ভার দিলেন। তাঁর লালনপালনের জন্য অনেক ধাত্রীও রাখা হলো।

পাঁচ

শিক্ষা

দিনের পর দিন যায়।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মত সিদ্ধার্থ বড় হচ্চেন। রাজাও সেই শিশুকে বুকে জড়িয়ে পত্নীশোক ভুললেন।

ধীরে ধীরে আট বছর কেটে গেলো। এবার কুমারের লেখাপড়া শেখবার বয়স হয়েচে।

তখনকার দিনে লেখাপড়া শেখাবার বড় সুন্দর নিয়ম ছিল। মুনিঋষিরা ছেলেদের শিক্ষার ভার নিতেন। সংসার হতে দূরে সুন্দর জায়গায় তাঁদের পবিত্র আশ্রম থাকতো। সেখানে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের অনেক কাজও শিখতে হতো। তার জন্যে কিন্তু ছেলেদের কিছু কষ্ট হতো না। গুরু আর গুরু-মার স্নেহ-যত্নে তারা মা-বাপের

অভাব বুঝতেই পারতো না। সেখানে তারা খুব ভালোই থাকতো। লেখা-পড়া শেষ হলে তবে তারা মা-বাপের কাছে ফিরতে পারতো।

শুদ্ধোদনের রাজত্বের সময়ে খুব বিদ্বান্ ও জ্ঞানী এক ঋষি ছিলেন। তাঁর নাম বিশ্বামিত্র। রাজা তাঁরই কাছে সিদ্ধার্থকে পাঠালেন বিদ্যাশিক্ষার জন্যে।

শুভদিনে সিদ্ধার্থের লেখাপড়া আরম্ভ হলো। তাঁর আশ্চর্য্য বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি দেখে বিশ্বামিত্র ঋষি তো অবাক্। একবার-মাত্র শুনেই সিদ্ধার্থ সব শিখে ফেলেন। গুরু অন্য ছেলেদের পাঠ দেন, সিদ্ধার্থ তাও শিখে নেন। এমনি করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

সিদ্ধার্থের গুরুভক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র ঋষি খুব যত্নে তাঁর জানা সব-কিছুই সিদ্ধার্থকে শিখিয়ে দিলেন।

এমনি করে সিদ্ধার্থের লেখাপড়া শেষ হলো। রাজার ছেলে—তাঁকে তো যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে। রাজা দেশবিদেশ হতে বড় বড় ওস্তাদ নিয়ে এলেন—ছেলেকে লাঠি-খেলা, তলোয়ার-খেলা ও তীর-ছোড়ার কসরৎ শেখাতে।

ওস্তাদরা কুমারকে কসরৎ শেখাতে এসে মুস্কিলে পড়লেন। তাঁরা দেখলেন, কুমারকে যা শেখাতে যান, তার বেশির ভাগই তাঁর জানা আছে। তাঁর সঙ্গে প্রথম দিনই লড়তে গিয়ে ওস্তাদদের বেগ পেতে হলো। কুমার এমন কৌশল দেখাতে লাগলেন যে, ওস্তাদরা অবাক্ হয়ে গেলেন।

তীর-ছোড়ায় তাঁর লক্ষ্য কোনবারেই ব্যর্থ হতো না। ঘোড়ায় চড়তেও খুব ভাল পারতেন তিনি। যতই দুষ্টু ঘোড়া হোক না, তিনি যেন তাদের যাদুমন্ত্রে বশ করে ফেলতেন।

এই রকমে শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধার্থ অল্পদিনেই বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

ছয়

করুণা

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সদ্‌গুণই সিদ্ধার্থের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগলো। সাহস ছিল তাঁর অসীম, কিন্তু তার সঙ্গে ছিল বুক-ভরা দয়া।

শিকার করতে গিয়ে পশুদের প্রতি করুণায় তাঁর মন ভরে যেত। আর তাঁর শিকার করা হতো না। ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার খেলায় ঘোড়ার কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থ নেমে পড়তেন ঘোড়া থেকে। তাতে সঙ্গীদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতেও তাঁর লজ্জা হতো না।

বসন্তকাল।

ফুলে ফুলে অশোক ও পলাশ গাছগুলি রঙিন হয়ে উঠেচে। আমের মুকুলের গন্ধে চারদিক্ মেতে উঠেচে। মৌমাছিদের দলে তাড়া লেগে গেচে মধু যোগাড় করতে। দখিণে হাওয়া ধীরে ধীরে ফুলেদের দোল দিচ্চে—আর তারই ফাঁকে ফাঁকে তাদের গন্ধটুকু চুরি করে নিয়ে পালাচ্চে। পশ্চিমের রক্ত-রাঙা আকাশে সূয্যিমামা তাঁর শেষ সোনালি আলোটুকু ছড়িয়ে দিয়ে নেমে পড়েচেন—চক্রবালের নীচে।

রাজার মনোরম প্রমোদ-কাননে এক অশোক গাছের ছায়ায় সিদ্ধার্থ চুপ করে বসে আছেন। ওদিকে অন্যান্য সমবয়সীরা কত খেলাধূলো আমোদ-প্রমোদে মত্ত। সিদ্ধার্থের সেদিকে খেয়াল নেই—একমনে বসে কি ভাবচেন।

হঠাৎ কাতর শব্দ করতে করতে একটা হাঁস পড়লো—একেবারে তাঁর কোলের উপর। একটা তীর বিঁধে আছে হাঁসটার বুকে, আর সেখান থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত পড়ছে। যাতনায় হাঁসটি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি হাঁসটিকে তুলে নিয়ে তীরটা বার করে সিদ্ধার্থ তার রক্তপড়া বন্ধ করলেন।

রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ এমনভাবে মানুষ হয়েছেন যে, যন্ত্রণা কাকে বলে তা তিনি তখনও জানেন না। হাঁসের বুকের তীর বার করতে গিয়ে তাঁর হাতে একটু লাগলো। ব্যথা যে কী, তা তিনি বুঝলেন। হাঁসটির কষ্ট দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো, চোখ জলে ভরে এলো। গভীর স্নেহে তিনি হাঁসটির গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

একটু পরেই শিকারের পোষাক-পরা তাঁর জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত এসে বললেন—"কুমার, হাঁস আমি মেরেচি, ওটা আমার, আমাকে দাও।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"মেরেচ বলেই হাঁসটি তোমার হবে? মেরে কারুর ওপর অধিকার পাওয়া যায় না—জীবন রক্ষা করে তবে অধিকার পেতে হয়। শত্রুতার অধিকারের চেয়ে ভালবাসার অধিকার

অনেক বড়। রাজ্যের বিনিময়েও এ হাঁস আমি তোমায় কিছুতেই দেবো না।”

রেগে আগুন হয়ে দেবদত্ত চল্লেন রাজার কাছে নালিশ করতে। রাজসভার বিদ্বান্-পণ্ডিতেরা দুপক্ষের হয়ে অনেক কথাই বললেন। শেষে এক বুড়ো মন্ত্রী বললেন—“জীবনের যদি কিছু দাম থাকে, তা হলে যে জীবন রক্ষা করে সে-ই তার অধিকারী হতে পারে,—যে হিংসা

করে সে, কখ্খনো অধিকারী নয়। কুমার পাখীটি বাঁচিয়েচেন, উনিই তার প্রকৃত অধিকারী। পাখীটি তাঁকেই দেওয়া হোক।”

এইরূপে প্রেমেরই জয় হলো।

পাখীটি বেশ সুস্থ হলে সিদ্ধার্থ তাকে ছেড়ে দিলেন। মনের সুখে কলধ্বনি তুলে হাঁসটি উড়ে গেল আকাশের বুকে,—যেন সিদ্ধার্থেরই জয়গান গেয়ে।

গভীর সুখে সিদ্ধার্থ চেয়ে রইলেন সেইদিকে—যতক্ষণ পাখীটাকে দেখা গেল।

সাত

প্রথম ধ্যান

সিদ্ধার্থ এখন বেশ বড় হয়েছেন।

রাজা ভাবলেন, ছেলেকে কিছু কিছু রাজ-কাজ শেখানো যাক। রাজ্যের সুখ-ঐশ্বর্য্য দেখলে তার মন মুগ্ধ হবে মনে করে তিনি একদিন সিদ্ধার্থকে ডেকে বললেন—"বৎস, ভবিষ্যতে আমার এই রাজ্য তোমার হবে। এই রাজ্য কত বড়, আর কী রকম ধনে-জনে ভরা একবার দেখবে চল।"

পিতা-পুত্রে রথে চড়ে নগরদর্শনে গেলেন। নগরের শোভা দেখতে দেখতে তাঁরা প্রান্তসীমায় ক্ষেতের দিকে এসে পড়লেন।

তখন ফাল্গুনের শেষ।

বলদের গলায় মালা পরিয়ে, লাঙ্গলের মাথায় ফুল জড়িয়ে নতুন কাপড় পরে মনের আনন্দে গান করতে করতে চাষীরা মাঠে

লাঙল দিচ্চে—নতুন বছরে ভাল ফসল পাবে বলে। আজ তাদের হলোৎসব।

মাঠের শেষে রোহিণী নদী। তার সবুজঘাসে-ঢাকা তীরে সবুজ গাছের সারি। অশোক পলাশ কৃষ্ণচূড়া—কতশত গাছ ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠেচে। শাখায় বসে কোকিল পাপিয়া মিষ্টি সুরে গান করচে। আমের মুকুলের গন্ধে বিভোর হয়ে মৌমাছিরা মধুর গুঞ্জন তুলেচে। কোন কোন গাছের ডালে নীলরঙের ঘাড় বাঁকা করে ময়ূর-ময়ূরী খেলা করচে। বনের ভেতর স্নিগ্ধ কালো ছায়ার মাঝে মাঝে ঠিক্‌রে-পড়া দুএক-ফালি সোনালি রোদ এসে আলো-ছায়ার এক স্বপনজাল বুনেচে, আর তারই মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে ছুটে বেড়াচ্চে হরিণছানার দল।

দিবাশেষের রাঙা আলো গাছপালার গায়ে-মাথায় ছড়িয়ে পড়ে তাদের আবীর-মাখা করে তুলেচে।

ওপারের দেবমন্দির হতে নহবতের মন-মাতানো সুর ভেসে আসচে।

শোভা দেখে সিদ্ধার্থ খুব আনন্দিত হলেন। রাজার মন খুশিতে ভরে উঠলো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় তার উল্টো।

রথ থেকে নেমে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রাজা শুদ্ধোদন নিশ্চিন্তমনে প্রকৃতির শোভা দেখচেন। এদিকে সিদ্ধার্থ কখন আনমনে কোন দিকে চলে গেচেন, তা তিনি জানতেও পারলেন না। সিদ্ধার্থ একাকী চলেচেন। কোথায় কেন যাচ্চেন তা তিনি নিজেই জানেন না।

চলতে চলতে সিদ্ধার্থ হঠাৎ দেখলেন—কৃষকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েচে, পরিশ্রমে তাদের খুব জোরে জোরে নিশ্বাস পড়চে, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেচে, আর তাদের গানও গেচে থেমে।

সিদ্ধার্থ ভাবলেন—মাত্র বেঁচে থাকবে, তারই জন্যে মানুষকে এত কষ্ট করতে হবে!

এই সময়ে তিনি দেখতে পেলেন, একটা বড় পোকা এসে একটা ছোট্ট পোকাকে খেয়ে ফেললো। পরক্ষণেই দেখলেন, একটা ব্যাং থপ্ থপ্ করে এসে সেই বড় পোকাটাকে খাচ্চে, এমন সময় প্রকাণ্ড এক সাপ এসে খপ্ করে মুখে পূরে দিল সেই ব্যাংটাকে। অমনি কোথা হতে এক ময়ুর এসে সেই সাপটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিল—আবার তাকে খাবার জন্যে এলো মস্ত বড় এক জানোয়ার!

বেদনায় সিদ্ধার্থের মন ভরে উঠলো। তিনি ভাবলেন—এই কী সুখের পৃথিবী! এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসা করে। সুখের তো কিছুই দেখচি না এখানে—সবই দুঃখে ভরা!

চুপ করে এক জামগাছের তলায় বসে কুমার ভাবতে লাগলেন—জীবের এত দুঃখ হয় কেন, আর তারা পরস্পরে এত হিংসাই বা করে কেন?

ভাবতে ভাবতে সব জীবের উপর করুণায় ও প্রেমে তাঁর বুক ভরে গেল। কিসে জীবের দুর্গতি দূর হবে, ভাবতে ভাবতে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন।

তাঁর তন্ময়তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধভাব ধারণ

করলে। শুধু পাতার ঝির্‌ঝির্‌ শব্দ ও নদীর কুলুকুলু ধ্বনি জানিয়ে দিলে—যেন বনদেবতারা সিদ্ধার্থের বন্দনা-গান গাইচেন।

শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে কাছে না দেখতে পেয়ে খুঁজতে বেরোলেন। খুঁজতে খুঁজতে তিনি এসে দেখলেন, সিদ্ধার্থ চুপ করে বসে আছেন—তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই।

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেচে। অবাক্‌ হয়ে শুদ্ধোদন দেখলেন, সব গাছের ছায়া সরে গেচে, কিন্তু সেই জামগাছের ছায়া একটুও সরেনি।

খানিক পরে ছেলেকে নিয়ে রাজা নগরে ফিরলেন।

আট

অশোকোৎসব

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধার্থের বয়স হলো আঠারো বছর।

রাজার আদেশে খুব সুন্দর তিনটি বাড়ী তৈরী হলো—সিদ্ধার্থের থাকবার জন্য।

বাড়ীগুলির চারদিকে ফুলের বাগান। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পুকুর—পদ্ম কুমুদ প্রভৃতি ফুলে ভরা। বসবার জন্য বাগানের ভিতর কুঞ্জে-ঘেরা বেদী। প্রমোদ-উদ্যান, খেলার মাঠ সবই তৈরী হলো।

স্বপ্নপুরীর মত মনোরম সেই বাড়ী তিনটির নাম দেওয়া হলো 'শুভ', 'রম্য', 'সুরম্য'। যাতে সিদ্ধার্থের মন ভুলে থাকে, তার জন্যেই এই সব ব্যবস্থা।

তা হলে কী হবে? সবাই আমোদে মত্ত থাকতেন—সিদ্ধার্থের কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। বেশির ভাগ তিনি নির্জ্জনে বসে যখন-তখন কী ভাবেন। ভাবগতিক দেখে রাজা মন্ত্রীদের ডেকে বললেন—'অসিতদেবলের কথা, বোধ হয়, আপনাদের মনে আছে। আমি

সিদ্ধার্থকে সংসারী করবার কত চেষ্টা করচি,—এত সুখ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও তার মন কিন্তু অন্য দিকে যাচ্চে। কুমারকে কী করে সংসারী করা যায়, আমাকে বলুন।"

বুড়ো মন্ত্রী বললেন—"মহারাজ, টুক্‌টুকে বৌমা নিয়ে আসুন, তা হলেই সব সেরে যাবে।"

রাজা বললেন—"সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ের খোঁজ করতে ভাল ঘটক পাঠিয়ে দিন। সমস্ত রাজ্য খুঁজে তিনি পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে আনবেন।"

মন্ত্রী বললেন—"তার চেয়ে অশোক-উৎসবের অনুষ্ঠান করে রাজ্যের যত সুন্দরী কুমারীদের নিমন্ত্রণ করুন। ঐ দিন কুমার স্বহস্তে তাঁদের অশোক-ভাণ্ড উপহার দেবেন—সৌন্দর্য্যের পুরস্কার হিসাবে। তা হলেই রাজপুত্র তাদের কারুর রূপ দেখে বিয়ে করতে চাইবেন। তখন আর ভাবনার কিছু থাকবে না।"

একটা ভাল দিন দেখে ঐ রকম ব্যবস্থাই হলো। রাজ্যে যত সুন্দরী কুমারী ছিল—ভাল করে সেজেগুজে একে একে এসে সিদ্ধার্থের কাছে উপহার নিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে অশোক-ভাণ্ড যা ছিল, সব শেষ হয়ে এলো।

সব শেষে এলো একটি মেয়ে—মেয়ে তো নয়, যেন চাঁদের কণা! কী সুন্দর গঠন যে সেই মেয়েটির, তা কী বলবো! কাঁচা সোনার মত তার গায়ের রঙ, পদ্মফুলের মত সুন্দর মুখখানি, কালো চোখ দুটি হরিণীর মতই টানা টানা। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল রেশমের মত নরম।

মেয়েটির নাম গোপা।

রাজপুত্র অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। এত রূপ রাজকুমার কখনো দেখেননি।

ধীরে ধীরে এসে ফুলের মত নরম হাত দুটি যোড় করে গোপা বললেন—"রাজপুত্র, আমার পুরস্কার কই ?"

নিজের আঙুল থেকে মণিময় অঙ্গুরি খুলে সিদ্ধার্থ গোপার আঙুলে পরিয়ে দিলেন।

যারা সেখানে ছিল, রাজার কাছে গিয়ে সব বললে। রাজা কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

গোপার পিতা দণ্ডপাণির কাছে শুদ্ধোদন দূত পাঠালেন—গোপার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহের প্রস্তাব করে।

দণ্ডপাণি বললেন—"আমার মেয়েকে অনেক রাজপুত্রই বিয়ে করতে চান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে ভাল তীর ছুড়তে, ঘোড়ায় চড়তে বা তলোয়ার খেলতে পারবেন, তাঁর সঙ্গেই আমি গোপার বিয়ে দেবো।"

রাজা চিন্তিত হলেন—আদরে পালিত সুকুমার সিদ্ধার্থ কি সবাইকে হারিয়ে দিতে পারবে ?

সব শুনে সিদ্ধার্থ বললেন—"বাবা, আমি যুদ্ধের প্রতিযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি, আপনি নগরে ঘোষণা করে দিন।"

ঠিক হলো, সপ্তাহপরে কপিলবস্তুর রঙ্গভূমিতে কুমারদের প্রতিযোগিতার যুদ্ধ হবে। যিনি জয়ী হবেন—তিনি গোপাকে বিবাহ করবেন।

নয়

বিবাহ

কপিলবস্তুর রঙ্গভূমি লোকে লোকারণ্য।

কত দেশ-বিদেশ থেকে রাজকুমারেরা এসেচেন প্রতিযোগিতা করতে। রাজপুরী হতে মেয়েরাও এসেচেন দেখতে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে দামামার আওয়াজ খেলার আরম্ভ জানিয়ে দিলে। বিপুল উৎসাহে কুমারেরা খেলা সুরু করলেন।

প্রথমে তীর-ছোড়ার পরীক্ষা। মস্ত বড় একটা ধনুকে ছিলা পরিয়ে তীর ছুড়ে একটা লক্ষ্য বিঁধতে হবে। লক্ষ্যটা হবে খুব একটা ছোট জিনিষ, আর সেটা থাকবে খুব দূরে।

তীর-ছোড়া তো দূরের কথা—অনেক রাজপুত্র ধনুকে ছিলা পরাতে গিয়ে ছিটকে পড়লেন দশ হাত দূরে।

মেয়েরা তো হেসেই খুন!

অনেক কষ্টে দেবদত্ত, নন্দ আর অর্জ্জুন সেটাতে ছিলা পরালেন। ছয় রশি দূর হতে নন্দ, আর আট রশি দূর হতে দেবদত্ত ও অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধলেন।

তারপর সিদ্ধার্থের পালা। তিনি ধনুখানায় এমনি জোরে গুণ দিলেন যে, সেটার দুই দিক্ এক জায়গায় এসে ঠেকলো।

হেসে সিদ্ধার্থ বললেন—"এ ধনুটা তো একটা খেলার জিনিষ। এর চেয়ে ভাল ধনু শাক্যবংশের যোদ্ধারা কি যোগাড় করতে পারেননি ?"

এখন, দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হিংসায় জ্বলে উঠে তিনি আর তাঁর দলের লোকেরা বললেন—"ঐ মন্দিরে শাক্য-বংশের পূর্ব্বপুরুষ সিংহহনুর বিখ্যাত ধনু আছে—যেটাতে ছিলা পরাতে পারে এমন বীর আজকাল শাক্যবংশে কেউ নেই। ওখানাই কুমার সিদ্ধার্থকে এনে দেওয়া হোক।"

সিংহহনুর ধনুখানা ছিল ভয়ানক ভারি। তার সমস্তটা লোহা দিয়ে তৈরী,—আর তার ওপর সোনার তার জড়ানো। চারজন লোকে হিমসিম খেয়ে সেখানা এনে সিদ্ধার্থের সামনে রাখলে।

তখন দেবদত্ত ও আরো অনেক রাজপুত্র সেখানায় ছিলা পরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছিলা পরাবেন ধনুটা নোয়াতে পারলে তো ? প্রাণপণ চেষ্টা করেও কেউ সেটা নোয়াতেই পারলেন না। লজ্জায় রাজকুমারদের মুখ লাল হয়ে উঠলো। মাথা হেঁট করে সবাই বসে পড়লেন আপন আপন জায়গায়।

সবশেষে সিদ্ধার্থ ধনুকটার মাঝখানে হাঁটুর ভর দিয়ে সহজেই

নীচ করে তাতে ছিলা পরিয়ে ফেললেন। তারপর যেখান থেকে লক্ষ্যটা দেখা যায়-কি-না-যায়, সেখানে গিয়ে তীর ছুড়লেন। নিমেষে তীরটা লক্ষ্য বিঁধে ফেললো।

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠলো। কুমার সিদ্ধার্থ জয়ী হয়েচেন।

তলোয়ার-খেলায় সিদ্ধার্থ সকলের চমক লাগিয়ে দিলেন। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কৌশল তিনি এত সুন্দরভাবে দেখালেন যে, দেবদত্তের দলের লোকেরাও প্রশংসা না করে থাকতে পারলে না।

এইবার ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষা। সিদ্ধার্থের ঘোড়াটি ছিল খুব ভাল। তিনি তাকে আদর করে 'কণ্টক' বলে ডাকতেন। কণ্টকের উপর চড়ে সিদ্ধার্থ সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের আগে দৌড়লেন সবচেয়ে বেশী দূর পর্য্যন্ত।

অন্যান্য রাজকুমারেরা বলে বসলো—"কণ্টকের মত ঘোড়ায় চড়ে সবাই আগে যেতে পারে। একটা নতুন ঘোড়ায় চড়ে যদি সিদ্ধার্থ জিততে পারেন, তবে বুঝতে পারি।"

তখ্খুনি আনা হলো একটা নতুন বুনো ঘোড়া। কী তেজী ঘোড়া! তিনটে লোকে তাকে ধরে আনলে। ঘোড়াটার চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা, ঘাড়ের কেশরগুলো চামরের মত দুলচে, রাগে তার নাক ফুলে ফুলে উঠচে।

এ পর্য্যন্ত তার পিঠে কেউ চড়তে পারেনি। অনেক রাজপুত্রই চেষ্টা করলেন তার পিঠে চড়তে। মাত্র অর্জ্জুনই একটিবারের জন্য তার পিঠে বসতে পারলেন—একটু পরেই ঘোড়াটা কিন্তু তাঁর পায়ে কামড় দিয়ে এমনি ফেলে দিলে যে, না ধরলে তাঁকে আর বাঁচতেই হত না।

এইবার সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে এলেন ঘোড়াটার কাছে। প্রথমে ডান হাতটি দিয়ে বেশ আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ এক লাফে চড়ে বসলেন একেবারে তার পিঠে। অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়াটা কিছুতেই সিদ্ধার্থকে ফেলতে পারলো না। শেষে সেই দুর্দ্দান্ত ঘোড়াটা এমন শান্ত হয়ে গেল যে, দেখে তো সবাই অবাক্।

সবাই একবাক্যে বললেন—"আর পরীক্ষার দরকার নাই, কুমার সিদ্ধার্থই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর।"

তখন গোপার পিতা দণ্ডপাণি বললেন—"বৎস সিদ্ধার্থ, তুমিই সবচেয়ে যোগ্য পাত্র। তোমার হাতেই আমি গোপাকে সমর্পণ করবো।"

ঠিক এই সময়ে গোপা ধীরে ধীরে এসে সিদ্ধার্থের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন।

অমনি উলুধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের দিক্ থেকে বেজে উঠলো শাঁখ। মহা ধূমধামে গোপার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে হলো। মহানন্দে শুদ্ধোধন ছেলে-বৌ নিয়ে রাজপুরীতে ফিরলেন।

দশ

প্রলোভন

রাজবাড়ীর কিছু উত্তরে ছোট্ট এক পাহাড়।

আষাঢ়ের মেঘের মত তার ধূসর রঙের চূড়াগুলি আকাশে গিয়ে ঠেকেচে,—পায়ের নীচে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে সবুজ মাঠ। পাহাড়ের ওপর থেকে নেচে নেচে চলেচে রোহিণী,—মাঠের মাঝখান দিয়ে।

নদীর দুই ধারে বড় বড় গাছ। গাছে গাছে দোল খাচ্চে নানান্ রঙের ফুলে ভরা লতা। রামধনুর রঙকে হার মানিয়ে বিচিত্র রঙের পেখম তুলে ময়ূরেরা নাচচে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে কাজল-কালো চোখ মেলে চকিত হরিণের দল কান খাড়া করে শুনচে—দূর হতে ভেসে-আসা রাখালের বাঁশরীর সুর। তাদের নাভি থেকে কস্তুরীর গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিক্ মাতিয়ে তুলেচে।

ঐ মাঠ হতে সুদূরে দেখা যায় বরফে-ঢাকা হিমালয়। সমুদ্রের ঢেউএর মত তার চূড়াগুলি স্তরে স্তরে মিলিয়ে গেচে নীল আকাশের মাঝে। সকাল-সন্ধ্যায় তার ওপর সূর্য্যের সোনালি কিরণ পড়ে কী সুন্দরই যে দেখায়! সমস্ত পাহাড়টায় কে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে!

সহরের গোলমাল থেকে দূরে এই মনোরম জায়গায় শুদ্ধোদন পুত্রের জন্য এক সুন্দর বাড়ী তৈরী করালেন। বাড়ীটির নাম হলো 'বিশ্রম্ভণ।'

কী সুন্দর সে বাড়ী! ঠিক যেন মায়াপুরী! চারদিকে সুন্দর ধব্‌ধবে শ্বেতপাথরের থামের সারি। তাতে আবার সুনিপুণ শিল্পীরা কত রঙ-বেরঙের লতাপাতা ফুল এঁকেচে—যেন সব সত্যিকারের ফুলগাছ থামগুলিকে জড়িয়ে আছে। দেওয়ালের গায়ে কত দেবদেবী, যুদ্ধবিগ্রহ ও আমোদ-প্রমোদের চিত্র আঁকা। সভাগৃহ মন্ত্রণাগার অন্দরমহল প্রমোদ-কক্ষ কিছুই বাদ যায়নি। দেশ-বিদেশ হতে নানান রকম সুন্দর সুন্দর সৌখিন জিনিষ এনে সে-বাড়ী সাজানো হয়েচে।

বাড়ীটির চারদিকে মনোরম প্রমোদ-উদ্যান। কত রকমের সুন্দর সুগন্ধ ফুল ও সুস্বাদু ফলের গাছে সাজানো সেই বাগান। লতাবিতান ও কৃত্রিম ঝরণায় তার শোভা শতগুণ বেড়েচে।

সিদ্ধার্থ ও গোপা খুব আনন্দেই সেখানে বাস করতে লাগলেন।

দেশ-দেশান্তর হতে ভাল ভাল নর্ত্তকী, গায়িকা ও বাদক আনা হলো। সব সময়ে তারা নাচগানে সিদ্ধার্থকে ভুলিয়ে রাখবে।

রাজার আদেশে বিশ্রম্ভণ প্রাসাদের ত্রিসীমানায় অসুন্দর কোন-কিছুর ঢোকবার যো ছিল না। ফুলগুলি ঝরে পড়বার আগেই, পাতাগুলি শুকোবার আগেই—ডাল হতে ছেঁটে ফেলা হত। কী জানি, এসব দেখে যদি কুমারের মন খারাপ হয়!

নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সিদ্ধার্থ ও গোপার দিনগুলি বেশ কাটে। রাজা ভাবেন—"এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, সিদ্ধার্থ আর সংসার ছেড়ে যেতে পারবে না। গণকদের শেষ কথাটা ফলবেই—নিশ্চয়ই সিদ্ধার্থ রাজচক্রবর্ত্তী হবে।"

কিন্তু এত সব করেও কি রাজার ভয় দূর হল? বিশ্রম্ভণ প্রাসাদের চারদিক্ ঘিরে রইলো খুব উঁচু প্রাকার; তার মাত্র চারটি সিংহদ্বার—প্রত্যেক দরজায় সশস্ত্র প্রহরী।

রাজা কড়া হুকুম দিলেন—"কাউকেই দরজা পার হয়ে বাইরে যেতে দেবে না—কুমারকেও নয়। আদেশ অমান্য করলেই মৃত্যুদণ্ড।"

এগারো

দর্শন

এমনি করে দিন যায়।

নূতন নূতন আমোদ-প্রমোদে, বিশেষ করে গোপার প্রাণঢালা সেবা-যত্নে সিদ্ধার্থের দিনগুলি কেটে যায় বেশ আরামেই। সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার লেশমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করতে দেওয়া হলো না। তাঁর মনে হলো, পৃথিবীর সুখ অফুরন্ত।

দিনের পর দিন এমনি কেটে যায়। একদিন সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হলো, নগর দেখতে যাবেন। খুশিমনে পুত্রকে নগরভ্রমণের অনুমতি দিয়ে রাজা প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন—"খুব ভাল করে নগর সাজাও, দেখে যেন যুবরাজ আনন্দিত হন।"

নগরে হৈ চৈ পড়ে গেল।

দোকানদারদের তো খুবই তাড়া পড়ে গেল। কত সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা দিয়ে তারা দোকান সাজালো; ভাল ভাল জিনিষপত্র থরে থরে সাজিয়ে রাখলো—যেখানে যেমনটি মানায়।

নগরবাসীরা আম্রপল্লব ও কলাগাছ দিয়ে তাদের বাড়ীর দরজা সাজালো। দরজার দুপাশে রাখা হলো মঙ্গলঘট কুমারের শুভ কামনায়। ধূপ-ধুনো ও গুগ্গুলের গন্ধের সঙ্গে ফুলের সুবাস মিশে চারদিক্ এক স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ করে তুললো। কপিলবস্তু যেন ইন্দ্রভুবন হয়ে উঠলো।

সুন্দর রথে চড়ে সিদ্ধার্থ নগর দেখতে বেরোলেন। রাজপথের দুপাশে কাতারে কাতারে প্রজারা দাঁড়িয়ে বন্দনা গান গেয়ে তাদের যুবরাজকে অভ্যর্থনা করলে। ছাদের উপর থেকে মেয়েরা পুষ্পবৃষ্টি করলে। চারদিকে আনন্দ-ধ্বনি উঠলো।

নগরের অপূর্ব্ব শ্রী দেখে যুবরাজ মোহিত হলেন, আরও মুগ্ধ হলেন প্রজাদের আন্তরিক রাজভক্তি দেখে। নগরের দৃশ্য তাঁর কাছে বড়ই মনোরম লাগলো।

বেড়াতে বেড়াতে কিছুদূর এগিয়েচেন, ভীড়ও অনেক কমে এসেচে, হঠাৎ রাজকুমার দেখতে পেলেন,—একটা লোক লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে চলেচে। তার সমস্ত শরীরের চামড়া লোল হয়ে গেচে, চুল একেবারে সাদা, মুখে একটিও দাঁত নেই, দেহ অনেকখানি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েচে। অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়ে সে হাঁফাতে হাঁফাতে চলেচে।

ছন্দককে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন—"সারথি, এ কে? এর এমন চেহারা কেন?"

ছন্দক বললেন—"কুমার, ও লোকটি বুড়ো। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় অকর্ম্মণ্য হয়ে গেচে। এখন ওর চোখের দৃষ্টি কম, কানেও হয়তো

শুনতে পায় না—শারীরিক পরিশ্রমের কাজও কিছু করতে পারে না। এক কথায় ওর শরীর হয়েছে জরাজীর্ণ—তাই চেহারাও অমন খারাপ হয়ে গেচে।”

সিদ্ধার্থ বললেন—“তা হলে তো ওর বড় কষ্ট! আচ্ছা, কেবল ওই কি বুড়ো হয়েচে? না, সকলেই ওই রকম হয়?”

একটু হেসে সারথি বললেন—“কুমার, বয়স হলে সকলকেই অমনি জরাজীর্ণ হতে হবে।”

শুনে সিদ্ধার্থ চমকে উঠলেন—“এঁ্যা, তা হলে আমাকেও তো অমনি হতে হবে! আমার গোপার অমন সুন্দর রূপও তো একদিন অমনি বিশ্রী হয়ে যাবে! তা হলে যে খুব কষ্ট ভোগ করতে হবে!”

সিদ্ধার্থের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সেদিনকার মত বেড়ানো শেষ হল।

তখন থেকে সিদ্ধার্থের আর কিছু ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই চুপচাপ বসে কি ভাবেন।

আর একদিন বেড়াতে যাচ্চেন—সিদ্ধার্থ দেখলেন, পথের ধারে একজন লোক শুয়ে আছে। কি বিশ্রী চেহারাই যে হয়েচে লোকটার! তার কঙ্কালসার দেহ হতে পুঁজ-রক্ত পড়চে, দুর্গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারচে না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে “জল জল” বলে চেঁচাচ্চে।

সিদ্ধার্থ ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন—“এ আবার কি? ও লোকটি অমন করচে কেন? ওর কি হয়েচে?”

সারথি বললেন—“কুমার, ওর অসুখ হয়েচে, রোগের যাতনায় ও

অমন চীৎকার করচে। শরীর থাকলেই কখনো না কখনো অসুখ করবেই—শরীর কিছু চিরদিনই সুস্থ থাকে না।”

সিদ্ধার্থের বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করে উঠলো। মানুষের আবার এত কষ্ট! তা হলে রূপ-সৌন্দর্য্য তো স্বপ্নের মত মিথ্যা! এসব দেখেও মানুষ কি করে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে পারে?

সিদ্ধার্থ বাড়ী ফিরলেন। আর কোন রকমেই নাচ-গান আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে পারেন না। সব সময়েই একা থাকতে ভালবাসেন।

এমনি করে দিন যায়।

আর একদিন কুমার বেড়াতে যাচ্চেন। নগরের শোভা আর ভাল লাগে না। সিদ্ধার্থ সারথিকে বললেন—“একটু নগরের বাইরের দিকে চল।” সারথি রথ নিয়ে গেলেন মাঠের দিকে।

ঠিক সেই দিক্‌টাতেই নদীতীরে শ্মশান। সিদ্ধার্থ দেখলেন, একজন লোক খাটের উপর শুয়ে আছে, আর চারজন সেটা কাঁধে করে কোথায় নিয়ে চলেচে। তাদের পিছনে অনেকগুলি স্ত্রীলোক ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্চে।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন—“সারথি, ও লোকটিকে অমন করে নিয়ে যাচ্চে কেন? আর যারা সঙ্গে যাচ্চে তারাই বা অত কাঁদচে কেন?”

সারথি বললেন—“যুবরাজ, ও লোকটির মৃত্যু হয়েচে। ওকে আর দেখতে পাবে না বলে ওর আত্মীয়-স্বজনেরা শোকে অধীর হয়ে কাঁদচে।”

সিদ্ধার্থ বললেন—"মৃত্যু? সে আবার কি?"

সারথি বললেন—"কুমার, জরা বা অসুখ-বিসুখে শরীর নিতান্ত অপটু হয়ে পড়লে দেহ হতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। তখন কাজ করবার আর কোন ক্ষমতাই থাকে না ঐ দেহটার। ওটা পড়ে থাকে মাত্র একটা জড় মাংসপিণ্ডের মত। শরীরের এই অবস্থার নামই মৃত্যু।"

নিমেষে সিদ্ধার্থের মুখ সাদা হয়ে গেল। খানিকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—"লোকটিকে এখন কোথায় নিয়ে যাচ্চে?"

ছন্দক বললেন—"শ্মশানে। সেখানে ওরা শবটি পুড়িয়ে ফেলবে।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"অমন সুন্দর শরীরটাকে পুড়িয়ে ফেলবে? তা হলে তো ওটা ছাই হয়ে যাবে! আচ্ছা, ছন্দক, আমাকেও কি মরতে হবে? আর আমার গোপা—তারও কি এই দশা হবে?"

নিঃশ্বাস ফেলে ছন্দক বললেন—"যুবরাজ, জন্মালে মরতে হবেই—তা শুধু তুমি কেন, সকলেই মরবে। কেউ মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পায় না।"

সিদ্ধার্থ তো স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মানুষ যে এত সাধ করে সংসার করে—ছেলেমেয়ে ধনদৌলতে ভরা সুখের সংসার—সব তাকে ছেড়ে যেতে হবে? তবে মানুষ তাই নিয়ে মত্ত থাকে কেন? আর জীবন, যৌবন, স্বাস্থ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য সবই যখন দুদিনের জন্যে তখন কেন লোকে সে-সবের জন্যে এত কষ্ট করে?"

ভাবতে ভাবতে সিদ্ধার্থের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো, তিনি ঠিক

করলেন—"জীবের এত দুঃখ-কষ্টের কারণ, ও তা থেকে নিস্তার পাবার উপায় আমাকে ঠিক করতেই হবে।"

সারথিকে বললেন—"আর বেড়াতে ভাল লাগে না, বাড়ী চল।"

তখন সাঁঝের আঁধার ধীরে ধীরে নেমে আসচে, মন্দিরে আরতির শাঁখ-ঘণ্টা বেজে উঠেচে।

বারো

বিরাগ

সিদ্ধার্থের কিছুই ভাল লাগে না।

রাজা চিন্তিত হলেন—বুঝি বা গণকদের কথাই সত্যি হয়। আবার নতুন নতুন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন—ছেলের মন ভুলোবার জন্যে।

কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। সিদ্ধার্থের ভাবগতিক দেখে গায়িকা বা নর্ত্তকীরা তাঁর কাছে গিয়ে নাচ-গান হাসি-তামাসা করতে আর সাহস করতো না।

সিদ্ধার্থ ভাবেন—জীবনই যদি মিথ্যা হলো তবে ধন-জনের উপর মায়া করে ফল কি? ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, মৃত্যুর সময় সবই তো ফেলে যেতে হবে, এমন যত্নের যে শরীর সেটাকেও ছাড়তে হবে, তা ধনজন তো দূরের কথা! এখন এই মায়ার বাঁধন হতে মুক্তি পাবার

উপায় কি? সিদ্ধার্থ দিনরাত এই চিন্তাই করেন, কিন্তু উপায় কিছু ঠিক করে উঠতে পারেন না।

অনেক দিন পরে একদিন তাঁর বাগানে বেড়াতে ইচ্ছা হলো।

সারথি রথ নিয়ে বাগানের দিকে চললেন। এই সময়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, একজন লোক সেইদিকে আসচেন। তাঁর পরনে গেরুয়া, হাতে ভিক্ষাপাত্র। কী সুন্দর ও প্রশান্ত তাঁর চেহারা! সদাপ্রফুল্ল মুখখানিতে চিন্তার ছায়াটুকু মাত্রও নাই। সর্ব্বাঙ্গ থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরোচ্চে! তাঁকে দেখলে মন আপনা আপনি প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

সিদ্ধার্থ বললেন—"দেখ, দেখ সারথি, ঐ একজন কে আসচেন! কী সুন্দর সংযত মূর্ত্তি! এমন তেজস্বী অথচ শান্ত রূপ আর তো কখনো দেখিনি! উনি কে, ছন্দক?"

ছন্দক বললেন—"কুমার, উনি ভিক্ষু. সংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করে শান্তির খোঁজ করচেন। কোন রকম চিন্তা, শোক, দুঃখ ওঁকে অভিভূত করতে পারে না, তাই সব সময়েই ওঁরা আনন্দে থাকেন।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"তাই বুঝি শাস্ত্রে সন্ন্যাস-আশ্রমের এত প্রশংসা? তা হলে সন্ন্যাসী হতে পারলে তো আর সংসারের তাপ-জ্বালায় দগ্ধ হতে হয় না। বুঝলাম, প্রকৃত সুখের পথই এই।"

তারপর সিদ্ধার্থ বাড়ী ফিরলেন।

তাঁর চিন্তাকাতর মুখ দেখে সঙ্গিনীরা কতই চেষ্টা করলো তাঁকে আনন্দ দিতে—কিন্তু সিদ্ধার্থ কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বললেন না।

ভাব-গতিক দেখে গোপার মন বেদনায় ভরে উঠলো। বললেন—"প্রভু, আজ তোমার এমন ভাব দেখচি কেন?"

সিদ্ধার্থ বললেন—"গোপা, জীবন বড় দুঃখময়; রূপ-ঐশ্বর্য্য মাত্র দুদিনের জন্যে, তাই জানতে পেরে আমার মন বড় অস্থির হচ্চে। কি করে দুঃখের হাত হতে নিস্তার পাওয়া যায় তাই ভাবচি।"

সেদিন সারারাত্রি সিদ্ধার্থ ঘুমুতে পারলেন না। এদিকে রাজা শুদ্ধোদন সমস্ত রাত্রি ধরে কত দুঃস্বপ্ন দেখলেন। একটা—দুটো—তিনটে—এমনি করে সাতটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলেন। সবশেষে দেখলেন, যেন খুব সুন্দর শ্বেতপাথরের একটা ধব্‌ধবে মন্দির। তার চূড়া আকাশে গিয়ে ঠেকেচে। সেই চূড়ায় বসে কুমার সিদ্ধার্থ দুহাতে কত উজ্জ্বল রত্ন ছড়াচ্চেন—আর পৃথিবীর নরনারী যত পারচে কুড়িয়ে নিচ্চে। সিদ্ধার্থের চারদিকে এক উজ্জ্বল জ্যোতি।

সকালে রাজা দৈবজ্ঞদের আনালেন ঐ স্বপ্নের অর্থ বিচার করতে। কিন্তু রাজসভায় যত পণ্ডিত ছিলেন কেউ স্বপ্নের অর্থ বলতে পারলেন না।

রাজা হুকুম দিলেন—"যেখান থেকে হোক পণ্ডিত আনা চাই—এ স্বপ্নের অর্থ জানতেই হবে।"

চারদিকে লোক ছুটলো পণ্ডিতের সন্ধানে। কিন্তু তেমন পণ্ডিত কোথাও মিললো না। শেষে কোত্থেকে এক বুড়ো সন্ন্যাসী এসে রাজার লোকদের বললে—"আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে চল, আমি তাঁর স্বপ্নের অর্থ বলবো।"

তাঁকে তো রাজার কাছে আনা হলো। একটি একটি করে তিনি সব স্বপ্নের অর্থ করলেন। তিনি বললেন—"মহারাজ, আপনার শেষের স্বপ্নটি বড়ই শুভ। আপনি স্বপ্নে যে শ্বেত-মন্দির দেখেচেন,

সেটি ধর্ম্মের মন্দির। ওরই উঁচু চূড়ায় বসে সিদ্ধার্থ জগতের জীবকে শিক্ষা দেবেন। তিনি যে শিক্ষা প্রচার করবেন, তা রত্নেরই মত বহুমূল্য। আপনার এই স্বপ্নে জগতের কল্যাণ সূচিত হচ্চে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যেই আপনার পুত্র সন্ন্যাসী হবেন।"

এই বলে সেই সন্ন্যাসী কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তা কেউ দেখতে পেলে না।

রাজা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পুত্রস্নেহে তিনি ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারলেন না। সিদ্ধার্থ যাতে বাড়ীর বাইরে যেতে না পারেন তার জন্যে প্রত্যেক তোরণে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়ে দিলেন, আর আদেশ দিলেন—"নতুন নতুন আমোদে পুত্রকে বশ কর।"

কিন্তু তা হলে কি হবে? অদৃষ্টকে কি বেঁধে রাখা যায়?

বৃদ্ধ, রুগ্ণ, মৃত—আর সেই শান্ত সন্ন্যাসীর কথা সব সময়েই সিদ্ধার্থের মনে জাগতে লাগলো। আর কি তিনি আমোদে যোগ দিতে পারেন?

তাঁর দৃঢ় ধারণা হলো—সন্ন্যাসী হতে পারলে তবে সংসারের দুঃখ-কষ্টের হাত হতে নিস্তার পাওয়া যায়।

মহারাজা শুদ্ধোদন রাজকাজ শেষ করে একাকী এক কক্ষে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময়ে সিদ্ধার্থ বরাবর তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

আশীর্ব্বাদ করে শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে বসতে বললেন। তারপর তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধার্থ বললেন—"বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে ও সুব্যবস্থায় খুবই সুখে আছি কিন্তু এতে আমি শান্তি

পাচ্ছি না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করবার জন্য আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করবো। আপনি আমায় অনুমতি দিন।"

শুদ্ধোদন চমকে উঠলেন, বললেন—"সে কি বাবা, তোমার কি এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করবার বয়স হয়েচে—সন্ন্যাসের কঠোর দুঃখ কি তোমার সহ্য হবে? এখন তুমি রাজ্য-সুখ ভোগ কর—তারপর বয়স হলে ছেলের হাতে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থে যাবে—এখন আমারই সন্ন্যাস নেবার সময়।"

অচল-অটল ভাবে সিদ্ধার্থ বললেন—"বাবা, সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা আমি ত্যাগ করতে পারি, যদি আমায় চারটি বর দেন।"

শুদ্ধোদন বললেন—"তোমায় অদেয় তো আমার কিছুই নেই বৎস, বল তোমার কি চাই?"

সিদ্ধার্থ বললেন—"আমায় বর দিন, জরা যেন আমার রূপ নষ্ট করতে না পারে, রোগ যেন আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না করে, আমার যেন মৃত্যু না হয়, আর কখনও যেন আমার ধনসম্পদের ক্ষয় না হয়।"

শুদ্ধোদন স্তম্ভিত—কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না। মুক্তোর মত অশ্রুবিন্দু তাঁর শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো—অজস্র ধারায়।

রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন—"সিদ্ধার্থ, যা চেয়েচ তা দেওয়ার ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই, তুমি অন্য জিনিষ চাও।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"বাবা, নশ্বর কোন কিছুই আমি চাই না, আমায় সন্ন্যাসী হবার অনুমতি দিন।"

শুদ্ধোদন নীরব। মাথা নীচু করে তিনি শুধু ভাবছিলেন—কী

করেচি আমি! সরু সুতো দিয়ে হাতী বাঁধতে চেষ্টা করেচি! দেবতাদের ভোগের জিনিষও জ্ঞানীদের কাছে অতি সামান্য! আর আমি সিদ্ধার্থকে ভুলোতে চেয়েচি—মানুষের ভোগের জিনিষ দিয়ে! সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞানী—তাই রাজভোগও তার কাছে তুচ্ছ। যে বংশে এমন জ্ঞানী ছেলে জন্মায় সে বংশও ধন্য!"

কিন্তু তিনি মুখফুটে কিছু বলতে পারলেন না। পিতাকে নিরুত্তর দেখে সিদ্ধার্থ আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তেরো
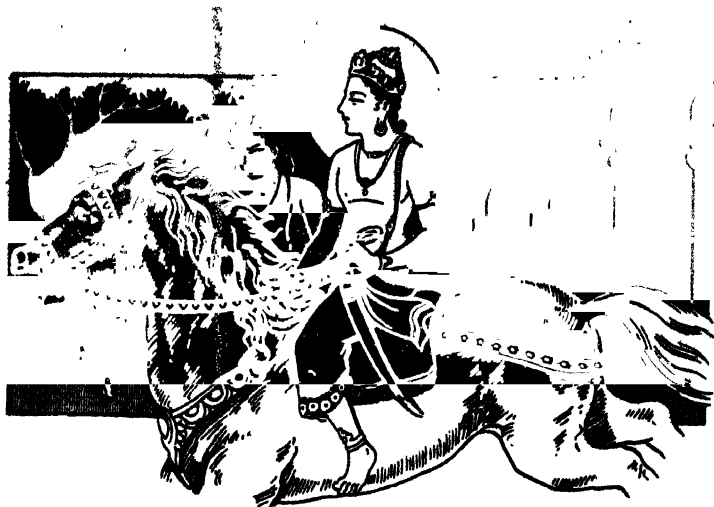
মহানিষ্ক্রমণ

তখন পাখীরা সেদিনের মত আহার শেষ করে কলরব করতে করতে ফিরেচে—যে যার বাসার দিকে। ঘরে ঘরে মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে তুলসীতলায় দীপ জ্বালাচ্চে—মন্দিরের আরতির বাজনার সঙ্গে রাজবাড়ীর নহবতখানার রোশনচৌকির মিষ্টি সুর মেশামিশি হয়ে ভেসে আসচে,—পূব-গগনে জ্যোৎস্নার হাসি ছড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে উঠচে,—ঠিক এমনি সময় বিশ্রম্ভণ-প্রাসাদের অন্দর-মহল হুলুরবে মুখরিত হয়ে উঠলো,—আর তারই সঙ্গে বেজে উঠলো শাঁখ।

চারদিকে লোকের ছুটোছুটি পড়ে গেল। রাজবধূ গোপার টুকটুকে এক পুত্র হয়েচে—ঠিক যেন আধফোটা পদ্মফুল!

নাতির জন্মোপলক্ষে মহারাজ শুদ্ধোদন রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিলেন—গরীবদুঃখীদের জন্যে। যার যত খুশি ধনরত্ন নিয়ে গেল।

আঁধারের বুকে প্রদীপের ক্ষীণ আলোটুকুর মত এখনও শুদ্ধোদনের মনে আশা হল—"এইবার বুঝি ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েচেন—পুত্রস্নেহে আবদ্ধ হয়ে সিদ্ধার্থ আর সংসার ছাড়তে পারবে না।"

খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের পর সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়লো। রাজপুরী নিস্তব্ধ—নিঝুম।

দুপুররাত্রে সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে বাইরে এলেন। নীল আকাশের কোলে পূর্ণচন্দ্রের মধুর শোভার দিকে একবার চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে গেলেন নাচঘরের দিকে।

অবসন্ন হয়ে নর্ত্তকীরা ঘুমিয়ে পড়েচে। বেনু, বীণা, মৃদঙ্গ, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে—সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

সিদ্ধার্থ দেখলেন—একটুখানি আগে যারা সচেতন ছিল, কত আমোদ-আহ্লাদ করছিল, তারাই এখন অচেতন-অজ্ঞান, যেন মৃত! তাদের সে মোহন বেশ নাই, সুগন্ধ ফুলের মালা ছিঁড়ে গেচে, কারুকার্য্য-করা কাপড় শিথিল হয়ে পড়েচে,—কারুর আবার মুখ থেকে লালা পড়চে,—সবই যেন বিশ্রী হয়ে উঠেচে।

দেখে সিদ্ধার্থের মনে হল সেই বৃদ্ধ, রুগ্ণ ও মৃতের কথা। মানুষের রূপ কত অল্পক্ষণের জন্যে! তাদের জীবন কত দুঃখ-কষ্টে ভরা! ভেবে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠলো।

সিদ্ধার্থ ভাবলেন—এই সব দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিস্তার পেতে হবেই।

অনিমেষ নয়নে সিদ্ধার্থ চেয়ে রইলেন—(পৃঃ ৪৭)

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে পড়লো সেই ধীর শান্ত সন্ন্যাসীর কথা। সংসার হতে দূরে গিয়ে কি অনাবিল শান্তি না ভোগ করচেন তিনি! এই রকমই তো হওয়া চাই।

এর পরই তাঁর মনে হলো নবজাত শিশুর কথা। একটু আগে তার জন্ম হয়েচে বলে কতই না উৎসব হয়ে গেচে।

সিদ্ধার্থ ভাবলেন—"এতো আবার বাঁধনের ওপর বাঁধন! আর কিছুদিন দেরি করলেই ছেলের উপর মায়া জন্মাবে—তখন সংসার ছেড়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। না, আর এক মুহূর্ত্তও সংসারে থাকা হবে না।"

তখনই সিদ্ধার্থ চললেন গোপার ঘরের দিকে। বিশ্রম্ভণ-প্রাসাদের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে গভীর সুখে নবজাত শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে গোপা অকাতরে ঘুমুচ্চেন। একটু দূরে ধাত্রীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না জানালা দিয়ে এসে গোপা ও নবকুমারের গায়ে ছড়িয়ে পড়েচে। অনিমেষ নয়নে সিদ্ধার্থ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন—গোপা আর তাঁর নূতন শিশুটির দিকে। তারপর গোপাকে উদ্দেশ করে বললেন—"গোপা, আজ আমি তোমাদের ছেড়ে চলেচি মুক্তির সন্ধানে, যতদিন মুক্তির উপায় খুঁজে না পাই ততদিন ফিরবো না, তুমি আমায় ক্ষমা করো,—বিদায়।"

এই বলে সিদ্ধার্থ ঘুমন্ত গোপার শয্যা তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে বেরোলেন সে ঘর থেকে।

পিতামাতার কাছ থেকেও ঠিক ঐভাবে বিদায় নিয়ে সিদ্ধার্থ ধীরে

ধীরে ছন্দকের ঘরে গেলেন। তাঁকে ডেকে বললেন—"ছন্দক, শীগ্‌গির 'কণ্টককে' সুসজ্জিত কর।"

ঘুম-জড়ানো চোখে ছন্দক সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—বিস্মিত হয়ে বললেন—"এ সময়ে কণ্টককে সাজিয়ে কি হবে, কুমার?"

সিদ্ধার্থ বললেন—"আস্তে কথা বল, ছন্দক। আমি আজ সংসারের বাঁধন কেটে চলেচি—মুক্তির সন্ধানে। তুমি আমার সহায় হও।"

ছন্দক বললেন—"সে কি প্রভু? মহারাজের প্রাণের চেয়েও প্রিয় একমাত্র পুত্র আপনি, আপনার কি সংসার ছেড়ে যাওয়া চলে? আপনি চিরকাল আদরে পালিত হয়েচেন, ভিক্ষুর কষ্ট কি আপনার সহ্য হবে? তা ছাড়া দৈবজ্ঞরা বলেচেন, আপনি একচ্ছত্র সম্রাট্ হবেন।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"একচ্ছত্র সম্রাট্ হতেই তো চলেচি, ছন্দক। পার্থিব রাজত্ব স্বপ্নের মত ক্ষণস্থায়ী; আমি যে রাজ্যের সন্ধানে যাচ্চি তা পৃথিবীর লক্ষ সিংহাসনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। শীগ্‌গির কণ্টককে আন।"

ছলছল চোখে ছন্দক বললেন—"আপনাকে হারিয়ে বৃদ্ধ রাজা কিরূপ শোকাতুর হবেন, ভেবে দেখুন। আপনার বিরহে বধূ গোপার কি দশা হবে, কুমার? আপনাকে না দেখে মা গৌতমীই বা কি করে বাঁচবেন?"

কুমার বললেন—"ছন্দক, এঁদের ভালবাসার চেয়ে বৃহত্তর ভালবাসায় আমাকে আকর্ষণ করচে; এঁদের কষ্টের কথার চেয়ে আরও

"বড় দুঃখ-কষ্টের ভাবনায় আমি কাতর হচ্চি। সারা জগতের সকল প্রাণীর দুঃখ-কষ্ট আমাকে অস্থির করে তুলেচে। সে দুঃখ-কষ্ট দূর করতে হবে। আমি আজ অমৃতের খোঁজে যাচ্চি—তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমায় নিয়ে চল, ছন্দক।"

ছন্দক আর কি করেন? সিদ্ধার্থের বড় আদরের ঘোড়া কণ্টককে জিন-বল্গা দিয়ে সাজিয়ে আনলেন।

দুপুর রাত্রে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে চললেন। বল্গা ধরে ছন্দকও চললেন সঙ্গে সঙ্গে। সারা রাত্রি ঘোড়া চললো। রাজধানী ছাড়িয়ে অনেক দূরে তাঁরা গিয়ে পৌছলেন।

তখনও প্রভাতী গানে পাখীরা বিশ্বজগৎ জাগিয়ে তোলে নি—অন্ধকারের বুক চিরে পূব-গগনের সোনালি আভাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নি—এমন সময়ে অনোমা নদীর তীরে সিদ্ধার্থ ঘোড়া হতে নামলেন।

মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কারগুলি ছন্দকের হাতে দিয়ে সিদ্ধার্থ বললেন—"ছন্দক, তুমি আমার মহা উপকার করলে, তোমার মঙ্গল হোক। এই আমার পোষাক ও গহনা নিয়ে যাও। তলোয়ার দিয়ে আমার চুলগুলি কেটে দিচ্চি; এগুলি পিতার চরণে উপহার দিয়ে বলো—সিদ্ধার্থের এই ভিক্ষা, যেন আমার ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত তিনি আমায় ভুলে যান। আমি জগতের দুঃখ দূর করবো—চললাম।"

এই সময়ে এক ব্যাধ যাচ্ছিল সেই দিকে। সিদ্ধার্থ আপনার দামী কাপড়ের বদলে তার ছেঁড়া কাপড় নিয়ে পরলেন।

কাঁদতে কাঁদতে ছন্দক ফিরলেন—কুমারের দেওয়া পোষাক পরিচ্ছদগুলি নিয়ে।

আবার সুখের সাগরে দুঃখের ঢেউ উঠলো। রাজার দুঃখে বনের গাছপালাও যেন কাঁদতে লাগলো।

সব শুনে সেই যে গোপা ভোগসুখ ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরলেন, জীবনে আর কখনো তা ছাড়লেন না। তাঁর সে বেশ দেখে পাষাণেরও বুক ফেটে যায়।

বনের পশু কন্টক—সেও অনেকদিন ঘাসটি পর্য্যন্ত মুখে দেয়নি। প্রভুভক্ত কন্টক কুমারের বিরহে অনাহারে প্রাণত্যাগ করলে।

চোদ্দ

শাস্ত্র-অভ্যাস

তখনকার দিনে বৈশালী ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী সহর। কপিল-বস্তুর মত এটিও একটি ছোটখাটো রাজ্যের রাজধানী।

বৈশালীতে একটি মঠ ছিল। সেখানে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, কাব্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হত। এত বড় শিক্ষাকেন্দ্র সে সময়ে খুব কমই ছিল। অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান্ সন্ন্যাসী এখানে থাকতেন। তাঁরাই শিক্ষার্থীদের শাস্ত্র পড়াতেন।

সিদ্ধার্থ এই মঠে কিছুদিন রইলেন। তখন সেখানে আনার-কালাম নামে খুব বিদ্বান্ ও জ্ঞানী এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর কাছে সিদ্ধার্থ অল্পদিনের মধ্যেই অনেক শাস্ত্র পড়লেন। কিন্তু তাতে জীবের দুঃখ-নিবারণের উপায় কিছু খুঁজে পেলেন না। শাস্ত্রের জ্ঞানে তাঁর তৃপ্তি

হলো না—তিনি মঠ ছেড়ে চললেন। কয়েকদিন পরে তিনি রাজগৃহে এসে পৌঁছলেন। রাজগৃহ ছিল মগধের রাজা বিম্বিসারের রাজধানী। এই সহরটির চারদিক ঘিরে আছে পাঁচটি পর্ব্বত। তাদের মধ্যে একটির নাম রত্নগিরি।

একটি সরু রাস্তা এঁকে বেঁকে চলে গেছে এই রত্নগিরির দিকে। সেই পথ ধরে খানিকদূর গেলেই পাহাড়ের গায়ে বন। বনটি যেমন রমণীয় তেমনিই পবিত্র। বড় বড় দেবদারু ঝাউ আরও কত গাছ আকাশ-ছোঁয়া মাথা তুলে স্থানটিকে ছায়া-শীতল করে রেখেছে—গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে। পাশেই রত্নগিরির বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে চলেছে এক ঝরণা,—তারপর হঠাৎ পথ হারিয়ে সাতটা রূপোর ধারা বইয়ে "সপ্তধারা" নাম নিয়ে আছড়ে পড়েছে গিয়ে সমতলের বুকে। দূরে রত্নগিরির চূড়াগুলি ধ্যানী মহেশ্বরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

এই পবিত্র বনভূমিতে এলে ভক্তির আবেশে মাথা আপনা-আপনি নত হয়ে পড়ে। এই রমণীয় বনে ছোট ছোট কুঁড়ে বেঁধে অনেক মুনি-ঋষি ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ করে শান্তিতে দিনগুলি কাটিয়ে দিতেন।

জায়গাটা সিদ্ধার্থের বড়ই ভাল লাগলো। এইখানে রত্নগিরির এক নির্জ্জন গুহায় বসে তিনি তপস্যা আরম্ভ করলেন। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন কোন দিকে চলে যেতো—তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতেন, কি করে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

কখনো কখনো তিনি নগরে ভিক্ষায় বেরোতেন। তাঁর দেবতার

মত চেহারা যে দেখতো সেই মুগ্ধ হয়ে যেতো। দেবতাজ্ঞানে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গৃহস্থগণ তাঁকে ভিক্ষা দিতেন।

এমনি একদিন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে সিদ্ধার্থ ভিক্ষায় বেরিয়েচেন, রাজা বিম্বিসার শুনলেন—কোন দেবতা নাকি নগরে ভিক্ষা নিতে এসেচেন। দূর হতে সিদ্ধার্থের দেবদুর্লভ রূপ ও অল্প বয়স দেখে রাজা অবাক্ হয়ে গেলেন। তারপর একাকী গোপনে তাঁর অনুসরণ করে রাজা তো সেই তপোবনে এসে হাজির। তখন বিম্বিসার নমস্কার করে সিদ্ধার্থকে বললেন—"ভিক্ষু, এত অল্প বয়সে আপনি সন্ন্যাসের কঠোর ব্রত অবলম্বন করেচেন কেন? এখন যে আপনার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ভোগ করবার সময়। আপনি দয়া করে আমার রাজপুরীতে চলুন। সেখানে আজীবন রাজ্যসুখ ভোগ করবেন। আমি অপুত্রক—আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনার। আপনি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।"

সিদ্ধার্থ মৃদু হেসে বিনীতভাবে বললেন—"মহারাজ আপনার মঙ্গল হোক, আমি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, কিছুই চাই না। রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধনজন পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, কিছুরই অভাব ছিল না আমার। কিন্তু ঐ সমস্ত মানুষকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না। এতে জীবের দুঃখ দূর হয় না দেখে আমি ভিক্ষু হয়েচি—পরম শান্তি লাভের আশায়।"

বিম্বিসার বললেন—"আপনাকে দেখেই মনে হয়েচে কোন মহৎ বংশে আপনার জন্ম। আপনার পরিচয় পেলে ধন্য হব।"

সিদ্ধার্থ আপনার পরিচয় দিলে বিম্বিসার আরও বিস্মিত হয়ে বললেন—"আপনি মিত্ররাজ শুদ্ধোদনের পুত্র! কী সৌভাগ্য যে, আপনি আমার এখানে এসেছেন!"

তারপর রাজার সে কি অনুরোধ সিদ্ধার্থকে রাজপুরীতে নিয়ে যাবার জন্যে!

কিন্তু যে স্বেচ্ছায় আপনার সমস্ত ভোগ ত্যাগ করে এসেছে—সে কি আর পরের ধনের প্রত্যাশা করে? সিদ্ধার্থ বিনীতভাবে পিতৃ-বন্ধুকে বুঝিয়ে ফেরালেন।

চোখের কোণে জল নিয়ে আব মনের ভেতর শ্রদ্ধা নিয়ে রাজা বিম্বিসার ফিরলেন নগরে।

রত্নগিরির পবিত্র গুহায় বসে সিদ্ধার্থ অনেকদিন ধরে কঠোর তপস্যা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর তৃপ্তি হয় না। এ দিকে দেহও দিন দিন দুর্ব্বল হতে থাকে।

একদিন তিনি অন্যান্য তাপসদের আশ্রমের দিকে বেড়াতে গেলেন। এখানে সবচেয়ে জ্ঞানী তাপস ছিলেন রামপুত্র রুদ্রক। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। সিদ্ধার্থ দেখলেন—সেখানে তাঁরা দেহকে কত কষ্ট দিয়ে কঠোর তপস্যা করচেন। কেউ অনাহারে কেউ বা অর্দ্ধাহারে একাসনে বসে তপস্যা করচেন। কেউ চারদিকে ভীষণ আগুন জ্বালিয়ে রেখেচেন—কেউ আবার গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে সাধনা করচেন। কেউ সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে নিশ্চল পুতুলের মত বসে ধ্যান করচেন। আবার কোন কোন সন্ন্যাসী সারা জীবন ধরে হাত তুলে ঊর্দ্ধবাহু হয়ে ধ্যান করচেন।

এই সব উগ্র তাপসদের সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনারা যে শরীরকে এত কষ্ট দিয়ে তপস্যা করচেন, কোনও শান্তির সন্ধান পেয়েচেন কি? এ রকম যন্ত্রণা সহ্য করে কি ফল হবে?"

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—"শরীরকে কষ্ট দিয়ে তপস্যা করলে পরলোকে স্বর্গলাভ হয়। আমরা তাই এরকম করচি।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"শাস্ত্রে আছে, যতদিন পুণ্য থাকে ততদিন মাত্র স্বর্গভোগ হয়,—পুণ্য ক্ষয় হলেই স্বর্গ হ'তে পতন। তাই যদি হয়, তবে সে অস্থায়ী স্বর্গের জন্য এত কষ্টের প্রয়োজন কি? তার চেয়ে মর্ত্ত্যের সুখদুঃখ ভোগ করা ভাল।"

তপস্বীরা তো চুপ!

খানিক পরে তাঁরা বললেন,—"অত শত জানি না। শাস্ত্রে যা বলে তাই করছি। আপনার ইচ্ছা হয় শাস্ত্রের আদেশ পালন করুন, নয়তো এখান থেকে যান।"

সন্ন্যাসীদের নমস্কার করে সিদ্ধার্থ বিদায় নিলেন। তিনি ভাবলেন—মানুষ অনিশ্চিত সুখের আশায় এত কষ্টও করতে পারে! তারা ভাবে না, তাদের কল্পিত সুখ কত অল্পক্ষণের জন্য,—আর যে দেহকে আশ্রয় করে তারা সুখ ভোগ করে সেই দেহই বা কত ধ্বংসশীল! এ সব দুঃখকষ্ট 'হতে কি করে মুক্তি পাওয়া যায়, তার চেষ্টা তো কেউ করে না!"

শেষ আলোকটুকু ছড়িয়ে দিয়ে সূর্য্যদেব তখন পাটে বসেচেন। ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার নেমে আসচে—নীল আকাশের গায়ে তারাগুলি একটি একটি করে ফুটে উঠচে,—সিদ্ধার্থ আপন গুহায় ফিরলেন।

পনেরো

কীশা-গৌতমী

সিদ্ধার্থের গুহার বাইরে একটি বড় গাছ। তারই ছায়ায় যোগ-সাধনার আসনের মত এক প্রকাণ্ড পাথর। একদিন সিদ্ধার্থ ঐ শিলাসনে চুপ করে বসে আছেন, এমন সময় দূরে বুকফাটা কান্নার শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই একজন স্ত্রীলোক তার শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সেখানে এল।

তারপর সিদ্ধার্থের চরণতলে সেই শিশুকে রেখে তার কী কান্না! সে কান্নায় পাষাণও গলে যায়।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করলেন—"মা, তুমি কে? কি জন্যেই বা এত কাঁদচো?"

মেয়েটি বললে—"প্রভু, আমার নাম কীশা-গৌতমী। আমার এই একমাত্র পুত্রকে সাপে কামড়েচে। আর সে খেলা করচে না, খাবার দিলেও খাচ্চে না, সবাই বললে "তোমার ছেলে মরে গেচে।" প্রভু,

তাই আমি আপনার কাছে আমার ছেলেটিকে এনেছি, আপনি দয়া করে তাকে বাঁচান।"

ছেলেটিকে দেখে সিদ্ধার্থ বললেন—"মা, তোমার ছেলের মৃত্যু হয়েচে। আর তাকে বাঁচানো যাবে না। তুমি তার দেহের সৎকার কর।"

চোখের জলে সিদ্ধার্থের পা-দুখানি ভিজিয়ে দিয়ে কীশা বললে—"না প্রভু, আপনাকে আমার ছেলের প্রাণদান করতে হবে।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"মা, জন্মালেই মৃত্যু হয়, জগতে কেউ চিরদিন বাঁচে না। তোমার পুত্রের আয়ু শেষ হয়েচে, তাই তার মৃত্যু হয়েচে।"

পুত্রশোকাতুরা গৌতমী কিন্তু কিছুই শোনেন না। তার ছেলের জীবন চাই-ই।

একটু থেমে সিদ্ধার্থ বললেন—"তুমি যদি আমায় দুটি কৃষ্ণতিল এনে দাও, তাহলে তোমার পুত্রকে বাঁচাতে পারি। কিন্তু এমন বাড়ী হতে তিল আনতে হবে যেখানে কেউ কখনো মরেনি।"

আশায় উৎফুল্ল হয়ে কীশা ছুটলো তিল আনতে। নগরে গিয়ে সে প্রথমেই গেল এক কৃষকের বাড়ী। সেখানে কৃষক-পত্নীকে কীশা বললে—"বোন, আমায় দুটি কৃষ্ণতিল দিতে পার? তাই দিয়ে ওষুধ তৈরী করে মহাপুরুষ আমার ছেলের জীবনদান করবেন।"

কৃষক-পত্নী বললে—"আহা, তা দেব বৈকি বোন, নিয়ে যাওনা তোমার যত দরকার। তোমার ছেলের কল্যাণ হোক।" এই বলে কৃষক-পত্নী তাকে অনেকগুলি কৃষ্ণতিল এনে দিলে।

এই সময় কীশার মনে পড়লো সিদ্ধার্থের শেষ কথা। সে জিজ্ঞাসা করলে—"হ্যাঁ বোন, তোমার বাড়ীতে তো কারুর মৃত্যু হয়নি?"

মরণের কথা শুনে কৃষক-পত্নী ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললো। তারপর ধরা গলায় বললে—"গত বছরে আমার বড় ছেলেটিকে হারিয়েছি, তার কথা মনে হলে—" আর বলতে পারলে না, সে আর্তস্বরে কেঁদে উঠলো। কীশার আর তিল নেওয়া হলো না।

ক্রমে ক্রমে কীশা নগরের সমস্ত বাড়ী গেল, কিন্তু মৃত্যুর অধিকার নেই এমন বাড়ী সে দেখতে পেলে না।

তখন ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে,—শেষে ভাবলে, রাজবাড়ী যাই, যেখানে নিশ্চয়ই মৃত্যু প্রবেশ করতে পারেনি। মহারাজের কত ধন-দৌলত, কত লোকজন, সেখানে কি আর কারুর মরণ হতে পারে? মহারাজের কত বড় বড় সব রাজবৈদ্য কত ভাল ভাল চিকিৎসক আছে।

এই ভেবে কীশা গেল রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীতে ঢোকা তো আর তার অদৃষ্টে কখনো ঘটে ওঠে নি, সদর ফটক পার হয়ে লোকজন জাঁকজমক দেখেই তো তার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। কোন রকমে সাহস করে ঝি-চাকরদের অনুনয়-বিনয় করে অন্দরমহলে গিয়ে একেবারে মহারাণীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললে—"রাণীমা, সাপের কামড়ে আমার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, আপনি আমায় একমুঠো তিল দিন, মহাপুরুষ আমার পুত্রের জন্যে ওষুধ তৈরী করবেন। রাণীমা তখ্খুনি চাকরের মাথায় একবস্তা কৃষ্ণতিল দিয়ে তাকে কীশার সঙ্গে যেতে বললেন।

তখন কীশা রাণীমাকে প্রণাম করে বললে—"মা এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই কারুর মৃত্যু হয়নি। যেখানে কারুর মৃত্যু হয়েচে সেখানকার তিলে ওষুধ হবে না।"

শুনে রাণীমা সজল চোখে বললেন—"দুমাস আগে আমার চাঁদপানা মেয়েটিকে যমের হাতে তুলে দিয়েচি। তার আগে নিষ্ঠুর যম আমার আরও দুটি ছেলেকে গ্রাস করেছে।"

রাণীমা আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

তিল রেখে কীশা ফিরলো। তারপর সিদ্ধার্থের কাছে গিয়ে তাঁর চরণে পড়ে বললে—"প্রভু বুঝেচি, আমি একাই ভাগ্যহীনা নই। দেখলুম, নগরের প্রত্যেকেই ছেলে মেয়ে, বাপ মা, ভাই বোন প্রভৃতি কোন-না-কোন প্রিয়জনের শোকে কাতর।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"ঠিক বলেচ, মা, এ সংসারে এমন স্থান কোথাও নেই, যা মৃত্যুর অধিকারের বাইরে। জন্ম হলেই মৃত্যু হয়, আর এই মৃত্যুর প্রতীকার কিছুই নাই। যাও তোমার পুত্রের সৎকার কর।"

কীশা বললে—"ভিক্ষু, আমি আমার মনের ওষুধ পেয়েচি, বুঝেচি জগতের এই নিয়ম।" এই বলে গৌতমী তাঁকে প্রণাম করে চলে গেল।

ষোল
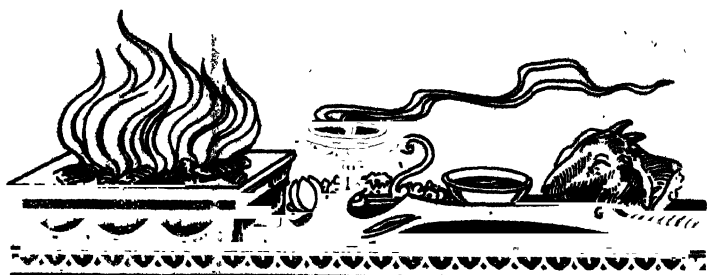
রাজগৃহে

রাজা বিম্বিসার ছিলেন অপুত্রক।

ব্রাহ্মণেরা বললেন—"মহারাজ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করুন, পুত্রলাভ করবেন।"

রাজার আদেশে প্রকাণ্ড যজ্ঞশালা তৈরী হলো। ভারে ভারে চন্দন-কাঠ ও ঘিয়ের কলসী আনা হলো। আর সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য আগের থেকেই প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

শুভদিনে পুরোহিতগণ যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁরা বেদীতে যজ্ঞাগ্নি জ্বাললেন। প্রতিদিন সেই জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দেওয়া হতো শত শত ছাগ ও মেষের রক্তে।

তখন দুপুরবেলা। আগুনের ঝলকানির মত চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করচে প্রচণ্ড রোদ। মাঝে মাঝে গরম বাতাস গা ঝলসে দিচ্চে—একটা চিল পর্য্যন্ত আকাশে ওড়ে নাই—পাখীরা সব আশ্রয় নিয়েচে পাতার ছায়ায়—গাছের ডালে। এমনি সময়ে এক মেষপালক

অনেকগুলি ছাগল ও ভেড়া নিয়ে যাচ্চে রত্নগিরির বনের ভেতর দিয়ে। প্রচণ্ড রোদে পশুগুলি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চলচে। দূর হতে সিদ্ধার্থ তাদের দেখতে পেলেন। তারা নিকটবর্ত্তী হলে পশুগুলির কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থ মেষপালককে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি এই প্রখর রোদে ছাগ ও মেষগুলি নিয়ে কোথায় যাচ্চ?"

রাখাল বললে—"মহারাজ বিম্বিসারের যজ্ঞশালায়, সেখানে এগুলিকে বলি দেওয়া হবে।"

সিদ্ধার্থ একটু চুপ করে রইলেন। পশুদের দুঃখে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এদের জীবন রক্ষা করবার জন্যে তিনি রাখালকে বললেন—"চল, তোমার সঙ্গে যাই, আমি যজ্ঞ দর্শন করবো।"

এই বলে একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্ছাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি তার সঙ্গে চললেন।

কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ রাখালের সঙ্গে নগরে উপস্থিত হলেন। নগরবাসীরা অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলো—সেই দেবকান্তি মহাপুরুষ বলির পশু নিয়ে আসচেন।

ক্রমে সিদ্ধার্থ যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা আগুনে ঘৃত আহুতি দিয়ে বেদমন্ত্র পাঠ করচেন—আর তাঁদের পাশে একজন লোক ধারাল খাঁড়া নিয়ে একটা ছাগকে বলি দিতে উদ্যত হয়েচে। পট্টবস্ত্র পরে মহারাজ বিম্বিসার যোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

হঠাৎ সিদ্ধার্থকে দেখে রাজা তো ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন—"আসুন,

একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি তার সঙ্গে চল্‌লেন। (পৃ ৬১)

আসুন, ভিক্ষু, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, যজ্ঞস্থলে আপনার দেখা পেলুম।"

মধুরস্বরে সিদ্ধার্থ বললেন—"মহারাজের মঙ্গল হোক। আপনার নিকট এই পশুগুলির প্রাণভিক্ষা করতে এসেচি। দয়া করে এদের জীবন রক্ষা করুন।"

এই বলে সিদ্ধার্থ স্বহস্তে বলির ছাগলটির বাঁধন খুলে দিলেন। ঘাতকের হাত হতে উদ্যত অস্ত্র পড়ে গেল। তাঁকে বাধা দিতে কারুর সাহস হলো না, সবাই একপাশে সরে দাঁড়াল।

রাজা তো রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন। দেবতাদের প্রীতির জন্যেই তো বলি দিতে হয়। আর সেই বলি বন্ধ করলে যে তাঁরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন। দেবতাদের ক্রোধ—সে যে কী ভীষণ! ভাবতেও রাজার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

তিনি সিদ্ধার্থকে বললেন—"তাহলে যে বড় অকল্যাণ হবে ভিক্ষু, দেবতার কোপে যে সর্ব্বনাশ হবে।"

ধীরস্বরে সিদ্ধার্থ বললেন—"মহারাজ সত্যিই কি তাই? দেবতারা কি এতই নিষ্ঠুর? রক্ত নইলে কি তাঁরা খুশি হন না? না, মহারাজ, দেবতারা যে দেবতা,—দয়াই তাঁদের ধর্ম্ম, আর হিংসা দানবের ধর্ম্ম; নিষ্ঠুরভাবে জীবহত্যা করে কেউ কখনো পুণ্যলাভ করতে পারে না—এতে বরং জীবহত্যার পাপ হয়। মহারাজ, এই রকম নিষ্ঠুর কাজ করবেন না। ঐ নিরীহ অসহায় প্রাণীগুলিকে বাঁচান—আপনার মঙ্গল হবে।"

মুহূর্ত্তে রাজা বিম্বিসারের মনের মধ্যে একটা প্রবল ঝড় বয়ে

গেল। বুক তাঁর ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো। তিনি ভাবলেন—"সত্যিই তো এ কী করচি আমি? এ কি ধর্ম্ম? এতো পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড! ছি, ছি, কি মহাপাপ করে এসেচি এতকাল ধরে!

অনুতাপে তাঁর চোখে জল এলো।

ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন—"পুরোহিতগণ, ঘৃতাহুতি দিয়ে যজ্ঞ শেষ করুন। এতগুলি জীবের প্রাণের বদলে আমি পুত্র চাই না।"

তারপর সিদ্ধার্থের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে রাজা বললেন—"মহাপুরুষ, আমায় ক্ষমা করুন, আমি মহাপাপী, তাই এতকাল ধরে জীবহত্যা করে এসেচি। এখন হতে আর কখনও জীবহত্যা করবো না। সন্ন্যাসী, এখন হতে আপনি সৎ উপদেশ দিয়ে আমায় ধর্ম্মপথে চালিত করুন।"

আশীর্ব্বাদ করে সিদ্ধার্থ বললেন—"মহারাজ, সত্যধর্ম্মলাভের জন্যেই ভিক্ষু হয়েচি। যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পারি—যদি প্রকৃত মুক্তির পথ জানতে পারি—তাহলে এসে আপনাকে জানাবো। এখন চললুম।"

সিদ্ধার্থ চলে গেলেন।

মুক্তি পেয়ে পশুগুলিও নির্ভয়ে রাখালের সঙ্গে চলে গেল।

কিছুদিন পরে সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ছেড়ে চললেন।

রামপুত্র রুদ্রকের পাঁচজন শিষ্য,—কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিক, বাষ্প, অশ্বজিৎ ও মহানাম সিদ্ধার্থের সঙ্গে গেলেন।

সতেরো

সাধনা

দূরে ছোট বড় নীল পাহাড়ের বাধা ঠেলে সমতল ভূমির উপর দিয়ে তর্ তর্ করে বয়ে চলেচে স্বচ্ছসলিলা নৈরঞ্জনা নদী। তুপাশে বড় বড় গাছের ছায়ায় ছোট ছোট গ্রামগুলি যেন সারাদিনের কাজের পর বিশ্রাম করচে। চারদিকে অ:নক দূর পর্য্যন্ত উর্ব্বর শস্যশ্যামল ক্ষেত—মাঝে মাঝে আবার ছোট বড় অরণ্য।

গয়ার আশপাশের গ্রামগুলির মধ্যে উরুবিল্বই ছিল একটু বড়, আর তার পাশেই নৈরঞ্জনার তীরে বিশাল অরণ্য—যেমন রমণীয়, তেমনি নির্জ্জন। সিদ্ধার্থ এখানে এসে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সিদ্ধার্থ একমনে চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে তুঃখ জয় করা যায়। খাওয়া-দাওয়া তো প্রায়

বন্ধ হলো। ক্বচিৎ কখনো গ্রামে গিয়ে ভিক্ষায় কিংবা বন্য ফলমূল খেতেন। কখনো-বা কোন রাখাল গরু চরাতে এলে, তার কাছে একটু দুধ ভিক্ষা করতেন। তাঁর দেবতার মত মূর্ত্তি দেখে রাখাল ভয়ে ভয়ে বলতো—"আমি যে নীচজাতি, শূদ্র, আমার ছোঁওয়া দুধ আপনাকে দেবো কি করে?" সিদ্ধার্থ বলতেন—"রাখাল, জাতি তো মানুষের তৈরী। সকল মানুষের শরীরে একই রক্ত, একই মাংস, কোন তফাৎ নেই। সকলেরই সুখদুঃখ-বোধ একই রকম। শুধু পৈতে পরলেই ব্রাহ্মণ হয় না,—যে সত্যপথে চলে, ন্যায়পরায়ণ হয়, সে-ই ব্রাহ্মণ, আর যে অন্যায় করে সে-ই শূদ্র—তা ছাড়া সবাই সমান।"

রাখাল আনন্দিতমনে ভক্তিভরে তাঁকে দুধ দিতো।

কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শীতই কেটে গেল, – তপস্বী সিদ্ধার্থের গাছতলা ছাড়া দ্বিতীয় আশ্রয় ছিল না। খাওয়া-দাওয়াও একেবারেই বন্ধ। অল্পাহারে অনাহারে সিদ্ধার্থ ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে পড়েন। তাঁর অমন সুন্দর চেহারা অস্থিচর্ম্মসার হয়। গরু চরাতে এসে রাখাল ছেলেরা ভয়ে দূরে পালায়—কঙ্কালসার পিশাচের মত তাঁর মূর্ত্তি দেখে।

ছয় বৎসর কেটে গেল এমনি কঠোর তপস্যায়। শেষে সিদ্ধার্থ এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন যে, তপস্যায় মন লাগানোর মত শক্তিটুকুও আর রইলো না।

কি করবেন, সিদ্ধার্থ কিছুই ঠিক করতে পারেন না। ছ-বছর ধরে এত কষ্ট করেও তো কোন ফল হলো না,—বরং শরীর হয়ে পড়লো নিতান্ত দুর্ব্বল। তা হলে কি এ তপস্যায় কোন ফলই হয় না?

ভাবতে ভাবতে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে গিয়ে সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনার শীতল জলে স্নান করে শরীর স্নিগ্ধ করলেন। তারপর জলের ওপর নুয়ে-পড়া এক গাছের ডাল ধরে তীরে উঠতেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কতক্ষণ এমনি কেটে গেল। মূর্চ্ছা ভাঙলে আস্তে আস্তে তিনি আগেকার জায়গায় ফিরে গেলেন।

শরীর এত দুর্ব্বল যে, সিদ্ধার্থ সোজা হয়ে বসে থাকতেও পারেন না। অশ্বত্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন, সামনের বনের পথ ধরে এক ভিখারী গায়ক যাচ্চে। হাতে তার এক ত্রিতন্ত্রী বীণা, একটু দাঁড়িয়ে সে বীণাটি বাজাতে চেষ্টা করচে।

বীণার প্রথম তারটা ছিল খুব আল্গা। গায়ক যেমন সেটায় ঘা দিয়েচে, অমনি এক বেসুরো বিটকেল আওয়াজ বেরোলো। আর একটা তার ছিল খুব টান করে বাঁধা। সেটায় হাত দিতে না দিতেই গেল পট্ করে ছিঁড়ে। মাঝের তারটা ছিল—না-আল্গা, না-টান। সেটা বাজাতেই মধুর ঝঙ্কারে সারা বন ভরে গেল। সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে গায়ক চলে গেল।

দেখে সিদ্ধার্থ ভাবলেন—"ঠিকই তো! মধ্যপথই সবচেয়ে ভাল। বীণার ঐ টান-করে-বাঁধা তারটির মত আমি যদি শরীরকে খুব কষ্ট দিই, তা হলে শরীর বেশীদিন থাকবে না। আবার যদি খুব ভোগবিলাসের মধ্যে শরীরকে সুখী করে তুলি, তা হলেও সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারবো না। তার চেয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আহার দিলে শরীর সুস্থ থাকবে। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সবল হবে। সবল হলেই

মনের চিন্তা-শক্তিও বেড়ে যাবে—তখন যদি জ্ঞানলাভের চেষ্টা করি, তবেই সফল হতে পারবো।

কিন্তু শরীর তো এখন বড়ই দুর্ব্বল, কি করেই বা খাবারের যোগাড় করি ?"

সন্ধ্যার অন্ধকার সারা বনভূমি ছেয়ে ফেললো। শ্রান্তদেহে সিদ্ধার্থ গাছের শিকড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমুতে ঘুমুতে সিদ্ধার্থ স্বপ্ন দেখলেন—যেন মস্ত বড় এক শয্যায় তিনি শুয়ে আছেন—সে শয্যা সমস্ত পৃথিবী। মাথার বালিশ হয়েচে পর্ব্বতরাজ হিমালয়। তাঁর ডান হাত ছুঁয়েচে পশ্চিম সাগর, আর বাঁ হাত ঠেকেচে গিয়ে পূর্ব্ব-মহাসাগরে। আবার সাদা ফেনার ফুল ছড়িয়ে, শত শঙ্খের গুরুগম্ভীর ধ্বনি তুলে, মলয় পবনের চামর ঢুলিয়ে, সিদ্ধার্থের পায়ে লুটিয়ে পড়চে দক্ষিণ মহাসাগরের নীল ঢেউগুলি।

নিদ্রাভঙ্গে পবিত্র আনন্দে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হলো। তারপর আরও চারটি স্বপ্ন দেখে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন, তাঁর সিদ্ধিলাভের দিন এগিয়ে আসচে।

রাত্রিশেষে সিদ্ধার্থ নৈরঞ্জনার শীতল জলে স্নান করে অশ্বত্থ গাছের শীতল ছায়ায় একটু বসলেন।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা।

এই পবিত্র দিনটিতে গ্রামে গ্রামে দেবপূজার ধূম লেগে যায়। উরুবিল্বের নিকটেই ছিল সেনানি গ্রাম। সুজাতা ছিলেন এই সেনানি গ্রামের এক ধনী বণিকের মেয়ে।

সেদিন সুজাতার দাসী পূর্ণা এসেছিল বনের মধ্যে গাছতলা পরিষ্কার করতে, সুজাতা বনদেবতার পূজা করবেন বলে।

সিদ্ধার্থের তেজোময় দেবতুল্য মূর্ত্তি দেখে, পূর্ণা তাড়াতাড়ি সুজাতার কাছে গিয়ে বললে—"দেবি, শীগগির এস, তোমার পূজা নিতে স্বয়ং বনদেবতা গাছতলায় উদয় হয়েচেন।"

সুজাতা তখন স্নান করে পবিত্র হয়ে, অনেকগুলি ভাল ভাল গরুর দুধ দুয়ে জ্বাল দিয়ে পায়স তৈরী করছিলেন। পায়স তৈরী হলে তিনি সোনার পাত্রে নিয়ে চললেন সেই বনে।

সুজাতা একদৃষ্টে সিদ্ধার্থের দেবকান্তির দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর পরম ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন—"হে বনদেবতা, আপনার উদ্দেশে পায়সান্ন রেঁধে এনেচি—গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন।"

"তোমার মঙ্গল হোক" বলে সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর সিদ্ধার্থ সেই পায়সান্ন ভক্ষণ করলেন—দেখে সুজাতা আপনাকে কৃতার্থ মনে করলেন।

সুজাতার দেওয়া পায়সান্ন খেয়ে সিদ্ধার্থের দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার হলো।

পরম পরিতৃপ্ত হয়ে সিদ্ধার্থ বললেন—"মা, তুমি আমার জন্যে অমৃতের মত উপাদেয় কি এনেছিলে? খেয়ে আমার শরীরে বলের সঞ্চার হলো।"

সুজাতা বললেন—"প্রভু, আমি বনদেবতার নিকট মানত করেছিলাম, যদি আমার একটি পুত্র হয়, তবে পায়সান্ন রেঁধে তাঁর পূজা

দেবো। দেবতার আশীর্ব্বাদে আমার পুত্র হয়েচে—তাই আজ বনদেবতার পূজা দিতে এসেচি।

হে বনদেবতা, আপনার উদ্দেশে পায়সান্ন রেঁধে এনেচি—গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন। (পৃঃ ৬৯)

সিদ্ধার্থ বললেন—"মা, তোমার পুত্রের কল্যাণ হোক। আমি দেবতা নই, তোমারই মত মানুষ। ছয় বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা

করে মরার মত হয়েছিলাম, তুমি খাবার দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করলে। আশা হচ্চে, এইবার আমি জ্ঞানলাভ করতে পারবো।"

যোড়হাতে বিনয়নম্রমুখে সুজাতা বললেন—"মহাপুরুষ, আমার যেমন কামনা পূর্ণ হয়েচে, এই পায়সান্ন খেয়ে আপনারও তেমনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ হোক।"

গলায় আঁচল দিয়ে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে সুজাতা চলে গেলেন।

তাঁকে পায়স খেতে দেখে কৌণ্ডিন্য, বাষ্প এঁরা সব ভাবলেন—"তপস্যার কঠোরতা ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ তপোভ্রষ্ট হয়েচেন—আর তাঁর কাছে থাকলে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে। এই বেলা তাঁর সংসর্গ থেকে চলে যাওয়াই ভাল।"

এই না ভেবে তাঁরা পাঁচজনে সিদ্ধার্থকে ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রথমে তাঁদের জন্যে সিদ্ধার্থের মনে একটু কষ্ট হলো। পরে বুঝলেন, তপস্যায় গভীরভাবে মন দেওয়ার সুবিধাই হলো এতে।

বিকেল বেলা ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো স্বস্তিক নামে এক ঘেসেড়া। গাছতলায় অপরূপ মহামূর্ত্তি দেখে সে একটু থমকে দাঁড়ালো। সিদ্ধার্থকে মাটিতে বসে থাকতে দেখে, স্বস্তিক বোঝা হতে ক-আঁটি কচিকচি নরম ঘাস নিয়ে সেই গাছতলায় একটি সুন্দর বেদী তৈরী করে দিলে তাঁর বসবার জন্যে।

তারপর দূর হতে প্রণাম করে ঘাসের বোঝা মাথায় তুলে স্বস্তিক চলে গেল।

কেউ তামাটে, কেউ কষ্টিপাথরের মত কালো, কেউ আষাঢ়ের মেঘের মত ধূসর, কেউ আবার শ্যাওলার মত শ্যামল।

এই সব বিকটাকার 'মার-সৈন্যদের' হাতে আবার তীর-ধনু, বর্শা, টাঙ্গি, কুড়ুল, তলোয়ার প্রভৃতি তীক্ষ্ণ সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র।

এই বিরাট বিশাল ভয়ঙ্কর বাহিনী নিয়ে মেঘরঙা প্রকাণ্ড হাতীতে চড়ে মার চললো সিদ্ধার্থ যেখানে সমাহিত হয়েছিলেন সেখানে।

প্রথমে দুর্যোগের সৃষ্টি করে মার সিদ্ধার্থের তপস্যা ভাঙবার চেষ্টা করলে।

হঠাৎ কাজলের মত ঘন কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেললো। চাঁদের দেখাটুকু পাওয়ার উপায় নাই—চারদিক্ গাঢ় অন্ধকার! মাঝে মাঝে চোখ-ঝলসানো বিদ্যুতের নখ দিয়ে—যেন বিরাট্ দৈত্যরা ভীষণ ক্রোধে সেই কালো কালো মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলচে। হাজার হাজার বাজ-পড়ার কড়াকড় শব্দে সমস্ত বন যেন কেঁপে উঠলো। শিলাবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ, ঝড়ের শন্‌শন্ আওয়াজ, গাছ-ভাঙার মড়্‌মড়্ ধ্বনি, মেঘের গুরুগুরু গর্জ্জন,—সব মিলে পৃথিবীর বুকে যেন প্রলয়-তাণ্ডব শুরু করেচে।

বনের পশুরা প্রাণভয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে চারিদিকে ছুটোছুটি করে পালাচ্চে।

সিদ্ধার্থের কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই। শান্ত ও স্থিরভাবে তিনি সমাধি-মগ্ন।

মার তখন সৈন্যদের আদেশ করলে—সশস্ত্র আক্রমণ করে সিদ্ধার্থকে পৈশাচিকভাবে মেরে ফেলতে।

তারাও অমনি আকাশ ফাটিয়ে হুহুঙ্কার করে ভীষণ ভীষণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে—সিদ্ধার্থকে লক্ষ্য করে।

সিদ্ধার্থের এতেই বা কি হবে ?

মনে যার কুভাব নাই, মার-সৈন্যরা কি তাকে পরাজিত করতে পারে ?

সব অস্ত্রশস্ত্রই ব্যর্থ হলো। সিদ্ধার্থ তাদের অধিকারের বাইরে—লক্ষ্যের বাইরে।

কিছুতেই না পেরে শ্রান্ত ক্লান্ত মার-সৈন্যেরা পালিয়ে গেল।

সৈন্যদের পরাজিত হতে দেখে মার তার তিন কন্যা তৃষ্ণা, রতি ও আরতিকে আদেশ করলো—মায়াজাল বিস্তার করতে।

নিমেষে ঝড়-ঝঞ্ঝা কোথায় চলে গেল। মেঘমুক্ত সুনীল নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হেসে উঠলো। গাছে-জড়ানো ফুলে-ভরা মাধবী লতারা মলয় হাওয়ায় দুলে দুলে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলো। যুঁই চামেলী বেল মালতীর গন্ধে সারা বন ভরে উঠলো। হঠাৎ-জাগা কোকিল পাপিয়া দোয়েল মিষ্টি-মধুর তান ধরলে—কালো কালো ভ্রমরেরা মৃদুমধুর গুঞ্জন তুললে।

তারপর মৃদঙ্গের তালে তালে বীণার সুরে সুর মিলিয়ে মধুর কণ্ঠে দেবকন্যারা যেন গান ধরলে। অপরূপ বেশভূষায় সেজে তৃষ্ণা, রতি ও আরতি কত হাবভাবে নাচলে, গাইলে, কত কৌশল করলে সিদ্ধার্থের তপস্যা ভঙ্গ করতে। তাদের গানের সুরে, নাচের তালে, বেণু-বীণার মধুর আলাপে, নূপুরের ঝঙ্কারে সারা বন যেন মুখরিত হয়ে উঠলো।

সংসারের মায়া যে [illegible], তার কাছে আবার এ সব ছলনার আকর্ষণ!

অটল অচলের মত ধীর স্থির সিদ্ধার্থের ধ্যান ভাঙলো না।

কোন রকম ছলনায় ভুলোতে না পেরে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে মার-কন্যারা পালিয়ে গেল।

মারের ভারী রাগ হলো। সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েও পরাজয় স্বীকার করতে চাইলে না সে। তখনো সে সিদ্ধার্থের ওপর প্রভুত্ব করবার আশা ছাড়তে পারলে না।

সবশেষে ভীষণ মূর্ত্তি ধরে সিদ্ধার্থের সামনে এসে, বজ্রের মত হুঙ্কার ছেড়ে মার বললে—"শাক্য-রাজকুমার, ঐ সব হাজার হাজার সৈন্যদের খেতে পরতে দিই আমি, আরো কত ভাল কাজ করি—যার সাক্ষী ঐ সমস্ত সৈন্যেরা। সেই পুণ্যেই মানুষের উপর আমার প্রভুত্ব। কিন্তু তুমি কী এমন পুণ্য করেচ—যার জন্যে আমায় হারিয়ে দিলে,—আর সে পুণ্যের সাক্ষীই বা কে?"

বাহ্যজ্ঞান-শূন্য সিদ্ধার্থ তখন ডান হাতে ভূমিস্পর্শ করে ধ্যান করছিলেন।

হঠাৎ মারের পায়ের কাছে মাটি যেন দুলে উঠলো। সে যেন শুনতে পেলে, সমগ্র পৃথিবী বলচে—"আমি, ওরে নির্ব্বোধ, যুগে যুগান্তরে আমিই ওঁর পুণ্যের সাক্ষী।"

মার আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

পুণ্যের কাছে পাপের পরাজয় হয়। সত্যিকারের মানুষের কাছে মারের সব চেষ্টাই হয় বিফল।

কালামুখ আরো কালো করে হুতরজ মার ফিরে গেলো আপন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে।

তখন চাঁদ অস্ত যাচ্চে—ধীরে ধীরে পূব-আকাশে উষার আলো ছড়িয়ে পড়চে,—চারদিক্ শান্ত-সুন্দর,—সেই শুভমুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ সম্যক্ জ্ঞানলাভ করলেন।

জ্ঞানের পবিত্র আলোকে সিদ্ধার্থ দেখলেন—হাজার রকমের দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে জীবকে চলতে হয়। নানা রোগ, শোক, জরা, তার উপরে দারুণ মৃত্যু-যন্ত্রণা, এই সব ভীষণ দুঃখ মানুষের আছে। এই সব দুঃখের কারণ হচ্চে জন্ম—জন্ম হলে এ সব ভোগ করতে হবেই। জন্মের কারণ হচ্চে আশা। নতুন নতুন সুখের কল্পনা করে মানুষ আশার পথে চলতে থাকে—এই আশার জন্যেই তার জন্ম। মানুষ আশা করে কেন? আশার কারণ হচ্চে ভ্রান্তি বা ভুল,—ধন-দৌলত, স্ত্রীপুত্র, এ সবের মধ্যে মানুষ সুখ পেতে চায়। কিন্তু এ সব জিনিষ মাত্র দুদিনের—দুদিনেই এ সব নষ্ট হয়ে যায়, তাই সত্যিকারের সুখও এ সবের মধ্যে নাই,—তবু তারা এগুলিকেই সুখের আকর বলে ভুল করে। এই ভ্রান্তিই হচ্চে সমস্ত কষ্টের মূল কারণ।

এই ভ্রান্তিকে দূর করতে হলে আশার ক্ষয় করতে হবে। মানুষ যদি আশা ছাড়তে পারে, রাগ, লোভ ও হিংসা না করে, সৎপথে চলে, পবিত্র ভাবে জীবন কাটায়, তা হলে তাকে আর জন্ম নিতে হয় না। সে সমস্ত দুঃখের হাত হতে নিষ্কৃতি পায়।

এই ভ্রান্তি দূর করতে, আশাকে নির্ম্মূল করতে বাইরের ক্রিয়া-কর্ম্ম, পূজা-অর্চ্চনা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানেরই শক্তি নাই। এর জন্যে দৃষ্টি,

সঙ্কল্প, স্মৃতি, বাক্য, কর্ম্ম, জীবিকা, ব্যায়াম, ধ্যান—এই সবকে পবিত্র করে তুলতে হবে—সত্যাশ্রয়ী ও সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। তা হলেই মানুষের সব দুঃখ নিঃসংশয়ে দূর হবে।

এমি করে চারটি 'আর্য্যসত্য' ও 'আষ্টাঙ্গিক' সাধনার কথা সিদ্ধার্থ জানতে পারলেন।*

এতদিনের সাধনার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। সিদ্ধার্থ যে জ্ঞানলাভ করলেন তার নাম সম্যক্ সম্বোধি অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান। জ্ঞান-লাভ করার পর সিদ্ধার্থের নাম হলো 'বুদ্ধ' অর্থাৎ জ্ঞানী; আর যে পবিত্র অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে সিদ্ধার্থ জ্ঞানলাভ করেছিলেন, সেটিকে বলে 'বোধিদ্রুম।'

* ১। দুঃখ আছে। ২। দুঃখের কারণ আছে। ৩। দুঃখের নিরোধ আছে। ৪। দুঃখ-নিরোধের উপায় আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে এই গুলি "চতুরার্য্য সত্য"।

আষ্টাঙ্গিক সাধনা—(১) সম্যক্ দৃষ্টি, (২) সম্যক্ সঙ্কল্প, (৩) সম্যক্ বাক্, (৪) সম্যক্ কর্ম্মান্ত, (৫) সম্যগাজীব (উপজীবিকা), (৬) সম্যক্ ব্যায়াম, (৭) সম্যক্ স্মৃতি, (৮) সম্যক্ ধ্যান।

উনিশ

ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন

মুক্তির বিমল আনন্দে বুদ্ধের হৃদয় পূর্ণ হলো। সাত সপ্তাহ ধরে বোধিবৃক্ষের তলায় বসে তিনি সেই আনন্দ ভোগ করলেন।

সপ্তম সপ্তাহের শেষ দিকে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলো ত্রপুষ ও ভল্লিক নামে দুই বণিক্। তাদের সঙ্গে পণ্যে-বোঝাই অনেক গো-গাড়ী ছিল। বনের পথে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের গাড়ী যায় কাদায় আটকে। সাহায্যের জন্য লোক খুঁজতে গিয়ে তারা দেখলো—স্বয়ং ব্রহ্মার মত তেজস্বী এক সন্ন্যাসী গাছতলায় বসে। গাড়ীর কথা—বিপদের কথা আর তাদের মনেই রইলো না।

বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে দুজনে চলে গেল; আবার একটু পরেই মধু ও পিঠে এনে তাঁকে আহার করতে দিল।

সিদ্ধিলাভ করার পর বুদ্ধের এই প্রথম আহার। খাওয়ার পর তিনি তাদের অনেক উপদেশ দিলেন।

তাঁর সুমধুর উপদেশ শুনে ত্রপুষ আর ভল্লিকের সত্য-জ্ঞান লাভ হলো। তারাই প্রথমে তাঁর 'উপাসক' * হলো। বুদ্ধের কাছে থেকে তাঁর সেবা করতে পাবে না বলে খুব দুঃখিত হয়ে তারা ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরে গেল।

এখন ভগবান্ বুদ্ধ ভাবলেন—"আমি যে মহাসত্য লাভ করেচি তা যদি জগতে প্রচার না করি, তা হলে লোকের কি উপকার হবে? তৃষ্ণার ফাঁদে পড়ে যারা জন্মজন্মান্তর ধরে দুঃখভোগ করে আসচে, তাদেরকে আমার নির্ব্বাণ-বাণী শোনাতে হবে।

কিন্তু প্রথমে কার কাছে এই পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করা যায়? এমন সুযোগ্য ব্যক্তি কে আছেন যিনি এই নবধর্ম্মের সার মর্ম্ম বুঝতে পারবেন?" তাঁর মনে হল ধর্ম্মপরায়ণ আনার কালামের কথা, কিন্তু আনার কালামের তখন মৃত্যু হয়েচে।

তার পরেই তাঁর মনে হলো, রামপুত্র রুদ্রক ধর্ম্মের জন্যে কত কঠোর সাধনাই না করছিলেন। সত্যপথ না জানলেও ধর্ম্মের উপর তাঁর আন্তরিক অনুরাগ ছিল—প্রবল। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁকেই এই সত্যবাণী প্রথম শোনাতে ইচ্ছা করলেন।

কিন্তু সাত দিন আগে রুদ্রকও দেহত্যাগ করেচেন।

---

* বুদ্ধের শিষ্য

রুদ্রকের সেই পাঁচজন শিষ্য—তাঁর সাধনার সহচর, কৌণ্ডিন্য, বাষ্প, ভদ্রিক, মহানাম আর অশ্বজিৎ তখন কাশীর কাছে ঋষিপত্তন গ্রামে থাকতেন। পূর্ব্বে তিনি তাঁদের ধর্ম্মের ক্ষুধা মেটাতে পারেন নি। এখন আর দেরী না করে তিনি চললেন তাঁদের সন্ধানে,—তাঁদেরকে তাঁর নূতন-পাওয়া অমৃতের অংশ দিতে।

দূর থেকে বুদ্ধদেবকে আসতে দেখে ঐ পঞ্চশিষ্য ভাবলেন—"সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই তপোভ্রষ্ট হয়ে ফিরছেন, আমরা তাঁকে আর গুরু বলে শ্রদ্ধা করবো না।"

ব্যাপারটি কিন্তু হয়ে বসলো উল্টো। সিদ্ধ সাধকের প্রশান্ত মুখের দিব্য জ্যোতি দেখেই তাঁদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো। তিনি কাছে এলে তাঁরা আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ বললেন—"প্রিয় শিষ্যগণ, কঠোর তপস্যা ও ভোগবিলাসের মাঝামাঝি এক মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছি;—মুক্তির সেই উপায় আমি তোমাদের দেখিয়ে দেবো।"

তাঁর দৃঢ় ও তেজোদীপ্ত কথা শুনে শিষ্যগণ ধর্ম্ম কথা শোনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ঋষিপত্তনের নিকট মৃগদাব (এখনকার সারনাথ) একটি সুন্দর স্থান। মৃগদাবের এক হ্রদের শ্যামল তীরে বসে স্নিগ্ধ সন্ধ্যার শান্ত মুহূর্ত্তে সেই পাঁচ জনে তথাগতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

ভগবান্ বুদ্ধ তাঁদেরকে মাধ্যমিক যানের কথা জানালেন, এবং জগতের দুঃখ ও তার কারণ, আর কি করলেই বা সেই দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়া যায়, তার উপায় বললেন।

তাঁরা বুঝলেন—খুব বেশী ভোগবিলাস, আর খুব বেশী কঠোরতা, এই দুয়ের মাঝামাঝি যে পথ—সেইটিই 'মাধ্যমিক যান'। এই পথে চললে শরীর আর মন দুইই ধর্ম ও জ্ঞান লাভের সহায় হয়।

তাঁরা আরও বুঝলেন—জন্ম হলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়, আর আশা বা তৃষ্ণা বশতই মানুষ বারবার জন্মায়। সুতরাং তৃষ্ণার হাত হতে মুক্তি পেলেই সমস্ত দুঃখকষ্টের পরপারে পৌঁছনো যায়। বাইরের কোন অনুষ্ঠানে এই তৃষ্ণাকে জয় করা যায় না। দৃষ্টি, সঙ্কল্প, বাক্য, কর্ম্ম, জীবিকা, ব্যায়াম, স্মৃতি ও ধ্যান পবিত্র হলে মানুষ সমস্ত দুঃখ হতে নির্ব্বাণ পেয়ে পরম শান্তি লাভ করে।

ভগবান্ তথাগত তখন তাঁদের সম্যক্-দৃষ্টি, সম্যক্-সঙ্কল্প, সম্যক্-বাক্য, সম্যক্-কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্-ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি, এই আষ্টাঙ্গিক সাধনা শিক্ষা দিলেন।

তাঁর সুমধুর সত্যবাণী শুনে বিস্মিত শিষ্যদের হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে গেল। সকলে সমস্ত রাত্রি ধরে সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে তাঁর উপদেশবাণী শুনলেন।

উষালোকে পূর্ব্বদিক্ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। শিষ্যগণ হ্রদের নির্ম্মল জলে স্নান করে এসে ভগবান্ বুদ্ধের চরণে প্রণাম করলেন।

তারপর মুক্তির বিমল আনন্দে বিভোর হয়ে তাঁরা ফিরলেন।

প্রথমে কৌণ্ডিন্যই সিদ্ধিলাভ করেন। তারপর অন্য চারিজন সিদ্ধ হন। তাঁরা সকলেই হয়েছিলেন 'অর্হৎ'—অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষ। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন।

কুড়ি

সঙ্ঘ

কৌণ্ডিন্য ও বাষ্প, এঁরা সব যখন এই নূতন ধর্ম্মের সারমর্ম্ম ঠিক ভাবে বুঝলেন তখন গৌতম-বুদ্ধ তাঁদের বললেন—"সত্যধর্ম্ম কি তা তোমরা জেনেচ। অজ্ঞানের অন্ধকার হতে আজ তোমরা জ্ঞানের আলোয় এসেচ। এ যেন তোমাদের নূতন জন্ম—নূতন জীবন। এখন হতে তোমরা পরস্পরকে সহোদর ভাই বলে জেনো। প্রেমে, পবিত্রতায় আর ধর্ম্মনিষ্ঠায় তোমরা এক হও। ধর্ম্মের জন্যে, সত্যের জন্যে তোমাদের এই যে পবিত্র মিলন—এ আজ হতে 'সঙ্ঘ' নামে কথিত হবে।"

শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা বুদ্ধের চরণ-ধূলি মাথায় দিলেন।

এই সময় একদিন কাশীধামের এক ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র যশ সংসারে বিরক্ত হয়ে গোপনে পালিয়ে যান। ঋষিপত্তনে, যেখানে বুদ্ধদেব বসেছিলেন, যশ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন—"উঃ, কি জ্বালা, সংসার কি ভয়ঙ্কর জায়গা!"

স্নেহমাখা স্বরে বুদ্ধদেব বললেন—"বৎস, এখানে ভীষণ বস্তু কিছুই নাই, তুমি আমার কাছে এস, তোমায় ধর্ম্মশিক্ষা দেব।"

যুবক তাঁর কাছে বসলেন। দুঃখ-নিবৃত্তির মঙ্গলময় বাণী শুনে যশ সান্ত্বনা পেলেন। তিনি আর গৃহে ফিরলেন না। বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করে সঙ্ঘে মিলিত হলেন।

ধনীর ছেলে যশের গায়ে অনেক গহনা ছিল; তাই তিনি বড় লজ্জা বোধ করতেন। সব বুঝতে পেরে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁকে বললেন —"যশ, সাজসজ্জার জন্যে তোমার লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। ধর্ম্ম বাইরের জিনিষ নয়, অন্তরের। মাত্র গৈরিক পরলেই সন্ন্যাসী হয় না, আর দামী গহনা, দামী পোষাক পরলেই যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করা যায় না তাও নয়। সুতরাং গহনার জন্যে তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।"

যশের বাবা খবর পেয়ে পুত্রকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে ঋষিপত্তনে এলেন। কিন্তু যশকে ফিরিয়ে নেবেন কি, বুদ্ধের মধুময় বাণী শুনে তিনিও এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। তবে বুদ্ধের আদেশে তিনি সংসারে ফিরলেন।

যশের পিতার মুখে সমস্ত শুনে যশের চারিজন বন্ধু—বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ আর গবাম্পতি ভাবলেন—"যশ কি নির্বোধ যে, সংসারের এত সুখ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়!"

ভ্রমমতি যশকে ফিরিয়ে আনতে তাঁরাও ঋষিপত্তনে গেলেন। যশকে ফেরাতে গিয়ে তাঁদেরও আর ফেরা হল না। তাঁরাও বুদ্ধের শরণ নিয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই এই নবধর্ম্ম ও বুদ্ধের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর মুখে ধর্ম্ম-কথা শোনবার জন্তে দেশ-দেশান্তর হতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো। তাঁর শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম-কথা শুনে অনেকে এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই শিষ্যসংখ্যা হল প্রায় ষাট জন।

সঙ্ঘের মধ্যে যাঁরা অর্হৎ অর্থাৎ 'মুক্তপুরুষ' হয়েছিলেন,—তাঁরা এই পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্তে বুদ্ধদেবের আদেশ নিয়ে দিকে দিকে চলে গেলেন।

সমস্ত বর্ষাটা ভগবান্ মৃগদাবে ছিলেন।

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাবার দূর্ব্বাশ্যামল পথগুলি শিশিরজলে ধুয়ে শরৎসুন্দরী তখন শিউলী ফুল ছড়িয়ে দিয়েচে। মাথার ওপর নির্ম্মল সুনীল আকাশ-চাঁদোয়া।

বুদ্ধদেব উরুবিল্ব গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করতে যাত্রা করলেন।

তখন সেখানে যে-সব ব্রাহ্মণ বাস করতেন তাঁরা সকলেই ছিলেন অগ্নির উপাসক। বুড়ো কাশ্যপ ছিলেন তাঁদের আচার্য্য। ভগবান্ বুদ্ধ এই কাশ্যপের বাড়ীতে অতিথি হলেন।

বুদ্ধের দেবতার মত মূর্ত্তি দেখে আর সারগর্ভ উপদেশ শুনে কাশ্যপ অগ্নিপূজার সমস্ত জিনিষপত্র নদীতে ফেলে দিয়ে তাঁর শিষ্য হলেন।

উরুবিল্ব থেকে কিছু দূরে থাকতেন কাশ্যপের দুই ভাই—নদীকাশ্যপ আর গয়াকাশ্যপ। স্নান করতে এসে নদীতে পূজার জিনিষ ভেসে যেতে দেখে, তাঁরা ভাবলেন কাশ্যপের বুঝি কোন অমঙ্গল হয়েচে। তাঁরা তো তাড়াতাড়ি এলেন উরুবিল্ব গ্রামে।

তারপর সমস্ত দেখে-শুনে এঁরাও বুদ্ধের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন; তাঁদের শিষ্যগণও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন।

কাশ্যপ ও অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধদেব এইবার রাজগৃহে গেলেন।

খবর পেয়ে রাজা বিম্বিসার অনেক অনুচর সঙ্গে নিয়ে ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যর্থনা করলেন।

তাঁর পবিত্র ধর্ম্ম-কথা শুনে বিম্বিসার ও তাঁর মন্ত্রীরা মুগ্ধ হলেন। তাঁরা সকলে একসঙ্গে এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হলেন।

অনেকে সংসারে থেকেই ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ পালন করতেন —তাঁদের বলা হত 'গৃহী শিষ্য'। রাজা বিম্বিসার এইরকম গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন।

বুদ্ধ ও অন্যান্য ভিক্ষুদের বাসের জন্যে রাজা বিম্বিসার 'বেণুবন' নামে একটি সুন্দর উদ্যান সঙ্ঘকে দান করেছিলেন।

বেণুবনে সশিষ্য বুদ্ধদেব অনেক দিন রইলেন।

একদিন শ্রমণ অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, পথে উপতিষ্য নামে এক জ্ঞানীর সঙ্গে দেখা। এই উপতিষ্য আর তাঁর বন্ধু কালিত ছিলেন সঞ্জয় নামে খুব বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির শিষ্য।

অশ্বজিতের প্রফুল্লমুখ ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে উপতিষ্যের মনে হল, "নিশ্চয়ই ইনি সত্যজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন।" তিনি অশ্বজিৎকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সৌম্য, আপনি কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী? আপনার গুরুই বা কে?"

অশ্বজিৎ বললেন—"ভদ্র, আমি ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য।"

উপতিষ্য বললেন—"আপনার গুরু কি শিক্ষা দেন?"

বিনীতভাবে অশ্বজিৎ বললেন—"অল্পদিন হলো আমি ভিক্ষু হয়েছি, ধর্ম্মের অতি অল্পই জানি। জগতের সমস্ত কাজের কারণ এবং সমস্ত কারণের নিরোধ আমাদের প্রভু শিক্ষা দেন। তিনিই সমস্ত বলতে পারেন, আমি কিছুই জানি না।"

এইটুকু কথাতেই উপতিষ্য বুঝলেন—ওঁর গুরুই সত্যজ্ঞানী মুক্তপুরুষ।

তারপর বন্ধু কালিতের কাছে সব বলে তাঁরা বেণুবনে গিয়ে বুদ্ধের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

বুদ্ধ অতি আদরে তাঁদের গ্রহণ করলেন। পরমযত্নে একে একে ধর্ম্মের সারমর্ম্মগুলি তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন।

উপতিষ্য ও কালিত দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দীক্ষার পর উপতিষ্যের নাম হলো 'সারীপুত্র' আর কালিতের নাম হলো 'মৌদগল্যায়ন"।

পরে এঁরাই বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হয়েছিলেন।

এম্নি করে অনেক যুবক সঙ্ঘে প্রবেশ করে ভিক্ষু হলেন। তাই রাজগৃহের অনেক লোক আবার ভগবান্ বুদ্ধের উপর বিরক্ত হয়ে নানান রকম বিদ্রূপ আরম্ভ করলে।

কেউ বললে—"মহামারী যেমন মানুষকে পৃথিবী-ছাড়া করে, গৌতমের শিক্ষাও তেমনি ছেলে-পিলেদের ঘর-ছাড়া করে।" কেউ বললে—"বুদ্ধ এখানে রাজত্ব জয় করতে এসেছেন,—আজ বেণুবন জয় করলেন, কাল হয়তো পুরী জয় করবেন।"

কেউ, কেউ আবার বলতো—"কাল গৌতম সঞ্জয়ের শিষ্যদের নিয়েছেন, আজ আবার দেখ কার উপর দৃষ্টি পড়ে।"

এইসব কথায় শিষ্যদের মনে বড় কষ্ট হতো।

বুদ্ধ তাঁদের বলতেন—"তোমরা সকলের সঙ্গে 'মৈত্রীভাবে' ব্যবহার করো। এসব কথায় কান দিও না, দুদিন পরে ওরা আপনা-আপনি বুঝতে পারবে। তখন সব বন্ধ হয়ে যাবে।"

হলোও তাই। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই অন্তরের সঙ্গে এই সুপবিত্র ধর্মের প্রশংসা করতে লাগলো।

কিছুদিনের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী রাজা ও বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন।

একুশ

কপিলবস্তু

আট বছর হলো কুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেচেন। এরই মধ্যেই কপিলবস্তুর কি পরিবর্ত্তন! এ যেন সে কপিলবস্তুই নয়; এখান কার অধিবাসীরাও যেন অন্য কোন রাজ্যের! তাদের মুখে সে হাসিও নেই, বুকে সে স্ফূর্ত্তিও নেই, সব বিষাদপূর্ণ—সমস্ত রাজ্য শ্রীহীন।

রাজবাড়ীর তো কথাই নেই! সেখানে আর পূর্ব্বের মত জাঁকজমক কোলাহল কিছুই নেই। প্রাসাদে যেন জনপ্রাণী বাস করে না। নহবৎখানায় রোশনচৌকির আর সে মনমাতানো সুর ওঠে না—এত যে লোক-লস্কর তার কোন চিহ্নই নেই। রাজবাড়ীতে কোন রকম ক্রিয়া-কাণ্ড তো হয়ই না—সব একেবারে চুপচাপ!

একমাত্র কুমারের বিরহে সমস্ত পুরী যেন খাঁ খাঁ করচে।

পুত্রহারা শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাবতী গৌতমী যে কি রকম দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন তা বলা যায় না।

রাজপুত্র-বধূ গোপা যেন মূর্ত্তিমতী বিষাদ-প্রতিমা। কুমারের গৃহত্যাগের পর হতে তিনি সব দামী দামী পোষাক-পরিচ্ছদ গহনাপত্র খুলে ফেলে সাদাসিদে কাপড় পরলেন। তখন হতে তিনি মাটিতে শুতেন,—কোন রকম বিলাসের জিনিষ ব্যবহার করতেন না। অযত্নে তাঁর রেশমের মত নরম চুল জটায় পরিণত হলো।

সখীদের সঙ্গেও বড় একটা মেলামেশা না করে দিনরাত কুমারের স্মৃতি ধ্যান করে তিনি কাটিয়ে দিতেন।

তাঁর যোগিনীর মত আলুথালু বেশ অলঙ্কারহীন দেহ যে দেখতো— সেই চোখের জল না ফেলে থাকতে পারতো না।

পুত্রবধূর এই সন্ন্যাসিনীর মত বেশ দেখে মহাপ্রজাবতী গৌতমী কাঁদতে কাঁদতে বলেন—"মা, সিদ্ধার্থকে হারিয়ে আমাদের বুক ফেটে যাচ্চে,তুমি আর এ বেশে আমাদের কষ্ট দিও না।"

ধীরভাবে বিনীত-কণ্ঠে গোপা উত্তর দেন—"স্বামী যার সন্ন্যাসী, তার আর অন্য বেশভূষায় দরকার কি মা? জগতের দুঃখ দূর করবার জন্যে তোমার ছেলে যখন স্বেচ্ছায় রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ছেড়ে গেচেন—তখন আমি আর ভোগ-বিলাসে কেমন করে কাল কাটাবো মা?"

মাতা গৌতমী আর কিছু বলতে পারেন না। চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি চলে যান।

রাজা শুদ্ধোদন দেশ-দেশান্তরে লোক পাঠালেন পুত্রের সন্ধানে। কিন্তু কেউ তাঁর খবর দিতে পারলো না।

বছর ধরে সন্ধানের পরও যখন সিদ্ধার্থের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন শুদ্ধোদন পুত্রের ফিরে আসা সম্বন্ধে হতাশ হলেন। তবু, যখনই দূরদেশ হতে কোন বণিক কপিলবস্তুতে আসতেন, তখনই শুদ্ধোদন তাঁকে সাধুসন্ন্যাসীদের কথা জিজ্ঞাসা করতেন—যদি কারুর বর্ণনার সঙ্গে সিদ্ধার্থের চেহারা মিলে যায়!

কিন্তু সিদ্ধার্থের খবর কেউ দিতে পারলেন না

কিন্তু হায়! তাঁরা কত দেশের কত সাধু-সন্ন্যাসীর কথাই বলতেন, শুধু সিদ্ধার্থের খবর কেউ দিতে পারতেন না।

এম্নি করে আট বছর কেটে যায়।

পারিজাতের গন্ধের মত ভগবান বুদ্ধের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্রমে কপিলবস্তুতেও সে খবর এলো। রাজা শুদ্ধোদন শুনলেন—তাঁর আদরের কুমার—তাঁর সিদ্ধার্থ এখন বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধ। দৈবজ্ঞদের প্রথম কথাই সত্য হয়েচে, পৃথিবীর রাজত্ব ত্যাগ করে কুমার ধর্ম্ম-রাজ্যের সম্রাট্ হয়েচেন।

তাঁর দুচোখ আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়ে আসে।

অন্দরমহলে সে খবর যায়। মহারাণী গৌতমী তো কেঁদে কেটে আকুল! তিনি একটিবার বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্যে রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন।

সন্ন্যাসিনী রাজপুত্র-বধূ সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব লাভের সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনলেন।

তাঁর মুখে একটিও রেখাপাত হলো না। একটুও শোক প্রকাশ করলেন না তিনি। তিনি যেন বুঝলেন—"তাঁর চোখের জলের পরিবর্ত্তে জগতের কোটি কোটি সন্তান যে রত্ন পেয়েচে—তার তুলনা নেই। কুমার দেবতার মত সকল রকমের শোকদুঃখের অতীত হয়েচেন। আজ জগতের সমস্ত নরনারী ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় ধর্ম্মকথা শুনে কৃতার্থ হচ্চে।" কুমারের উপর তাঁর প্রেম, তাঁর ভালবাসা, আজ শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত।

তাঁর ধৈর্য্য দেখে রাজারাণী অবাক্ হয়ে যান, পুরবাসীরা ভাবেন গোপা মানবী নন—দেবী।

তখন ভগবান্ বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে।

শুদ্ধোদন রাজগৃহে দূত পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন—"পুত্রকে বলো, অনেক দিন তোমায় না দেখে তোমার পিতামাতা বড় কাতর হয়েচেন, একটিবারের জন্তে তাঁরা তোমায় দেখতে চান।"

একজনের পর একজন করে দূত তো পাঠালেন অনেক, কিন্তু তাঁদের কেউ কপিলবস্তুতে ফিরলেন না। যাঁরা বেণুবনে গিয়ে ভগবান্ বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখেন ও দুঃখ-অপহারী কথা শোনেন, তাঁরাই কপিলবস্তুর সমস্ত কথা ভুলে যান। শিষ্যসঙ্ঘে মিলিত হয়ে তাঁরাও ভিক্ষু হন।

শেষে শুদ্ধোদন অনেক অনুনয় করে পাঠালেন সিদ্ধার্থের বাল্যসঙ্গী উদয়ীকে। বৃদ্ধ রাজার ব্যাকুলতায় উদয়ীর বড় কষ্ট হলো। বুদ্ধদেবকে নিশ্চয়ই কপিলবস্তুতে আনবেন স্থির করে উদয়ী চললেন বেণুবনে।

সেখানে গিয়ে উদয়ীও সঙ্ঘে মিলিত হলেন—কিন্তু তিনি মহারাজের কথা ভুললেন না।

একদিন সুযোগ পেয়ে ভগবানের চরণে প্রণাম করে উদয়ী শুদ্ধোদনের কথা নিবেদন করলেন।

সমস্ত শুনে ভগবান বুদ্ধ বললেন—"উদয়ী, পিতার আদেশ মত আমি কপিলবস্তুতে যাচ্চি, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো।"

তার পর একদিন ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধ কপিলবস্তুর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাইশ

প্রত্যাবর্ত্তন

কপিলবস্তু উল্লাসে মেতে উঠেচে।

আট বছর পরে কুমার সিদ্ধার্থ আজ বিশ্ববরেণ্য বুদ্ধ হয়ে ফিরচেন।

কি ভাবে তাদের সন্ন্যাসী-কুমারের অভ্যর্থনা করবে পুরবাসীরা তারই জল্পনায় ব্যস্ত।

এখন তো আর শুধু তাদের 'রাজকুমার' নয়—যে, তোরণ, ফুলের মালা, পতাকা দিয়ে নগর সাজিয়ে বাজনা বাজিয়ে, নাচ-গানে মহোৎসবের সৃষ্টি করে তারা তাঁকে বরণ করে নেবে। এ যে বুদ্ধ—এ যে ভগবান্!

বৃদ্ধরা পরামর্শ করলেন, নগরের বাইরে—আম্রকাননে ভগবানের অভ্যর্থনার আয়োজন করবেন।

কপিলবস্তুর এই আমবাগানটি ছিল খুব বড়, মহারাজ শুদ্ধোদনই এর মালিক। সমস্ত বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটি বড় গাছের ছায়ায় বুদ্ধের উপযুক্ত বেদী তৈরী করে, সাদা সাদা পদ্মফুলে সাজিয়ে, ধুনা-গুগ্‌গুলের গন্ধ দিয়ে, সারি সারি ঘিএর প্রদীপ জ্বেলে পুরবাসীরা প্রতীক্ষা করচে—যেন ভক্তরা প্রতীক্ষা করচে তাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত ভগবানের।

নগর ছেড়ে সবাই এসেচে সেই আমবাগানে। ক্রমে হলদে রংএর পোষাক পরা বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভগবান্ বুদ্ধ এসে উপস্থিত হলেন।

শাক্যবংশের প্রধান প্রধান বৃদ্ধেরা তাঁদের আত্মীয় বুদ্ধকে অভ্যর্থনা করতে গেলেন।

প্রথমে ভেবেছিলেন, তাঁরা বুদ্ধের চেয়েও বয়সে অনেক বড়, সুতরাং তাঁকে নমস্কার করবেন না। কিন্তু বুদ্ধের সেই সুন্দর শান্তিময় মূর্ত্তি, সেই অপরূপ স্বর্গীয় সুষমায় ভরা মুখ দেখে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সকলের মাথা নত হলো। বৃদ্ধরাজা শুদ্ধোদন—তিনিই ভুলে গেলেন যে তিনি পিতা, অন্যান্য শাক্যদের মত তিনিও পুত্ররূপী ভগবান্‌কে প্রণাম না করে থাকতে পারলেন না।

বুদ্ধ মধুর বাক্যে শোক-কাতর পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর সেদিনকার মত তিনি সেখানে বিশ্রাম করলেন।

হাজার তারার মাঝে পূর্ণচন্দ্রের মত শত শত সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব আজ কপিলবস্তু নগরে ভিক্ষায় বেরিয়েচেন। অপূর্ব্ব-সুন্দর ভিখারী! সোণার রংকে হারমানানো তাঁর দেহজ্যোতি—পীতবসনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। বাঁ কাঁধের উপর পীত উত্তরীয়—ডান

হাতে ভিক্ষাপাত্র আর বাঁ হাতে দণ্ড। বড় বড় দুটি চোখের দৃষ্টি হতে করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতি ঝরে পড়ছে।

প্রাসাদের ছাদে, গবাক্ষে, দরজায় কাতারে কাতারে মেয়েরা দাঁড়িয়েছেন—তাঁদের কুমার বুদ্ধকে দেখবার জন্যে।

ভিক্ষা দেবেন কি, পুরবাসিনীরা তো কেঁদেই আকুল! তাঁদের ভাবী পালক, রাজরাজ্যেশ্বর সিদ্ধার্থ কিনা আজ ভিক্ষু!

পথের মাঝে পুত্রের ভিখারীর বেশ দেখে রাজা শুদ্ধোদন আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রুদ্ধস্বরে তিনি বললেন—"রাজকুলে জন্ম নিয়ে তোমার এ কী বেশ? অতুল ধনের অধিকারী হয়ে তোমার হাতে ভিক্ষাপাত্র?"

শুদ্ধোদন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকেন।

বিনীত কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন—"পিতা, এতো আজ নূতন নয়, এ-যে আমার কুলধর্ম্ম।"

শুদ্ধোদন বললেন—"সে কি বৎস, শাক্যবংশে জন্মে কেউ তো কখনো ভিক্ষা করেন নি।"

ভগবান্ বললেন—"পিতা, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণ সবাই রাজ্য ধন-জন ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেচেন, বুদ্ধেরা চিরকাল এই-ই করে থাকেন।

বুদ্ধের মুখে আরও অনেক সারগর্ভ উপদেশ শুনে রাজা শুদ্ধোদনের মনে বৈরাগ্যের উদয় হলো। তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন তাঁর কুমার আজ জগতের পরিত্রাতা। রাজ্য ঐশ্বর্য্যের অভিমান তাঁর এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। পুত্রের কাছে ধর্ম্মগ্রহণ করে তিনি গৃহী উপাসক হলেন।

এরপর সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষার জন্যে গৌতম বুদ্ধ মহাপ্রজাবতী গৌতমীর কক্ষে গেলেন।

সুদীর্ঘ আট বছর পরে সিদ্ধার্থের মধুর কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনে আর তাঁর নবীন সন্ন্যাসীর বেশ দেখে মাতা গৌতমী মূর্চ্ছিতা হলেন।

জ্ঞান হলে রাণী এক দৃষ্টে বুদ্ধের মুখপানে চেয়ে হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন। তারপর বললেন—"এ কী দেখচি, পুত্র, রাজকুমার তুমি—তোমার রাজ-আভরণ কোথায় বাছা?"

বুদ্ধের কোন কথা বলবার আগেই মহারাজ শুদ্ধোদন বললেন—"রাণি, আর রাজ-আভরণে কাজ কি? তোমার কুমার যে রত্নে সজ্জিত হয়েচেন, তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত রত্ন নিতান্ত ম্লান। আমি পুত্রের কাছে ধর্ম্ম গ্রহণ করেচি, তুমিও দীক্ষা নাও।"

তখন রাণী গৌতমীও পুত্রের নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে মহারাজের সহিত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হলেন।

পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুদ্ধ আম্র-কাননে ফিরলেন।

দিনের পর দিন কপিলবস্তুর অধিবাসীরা বুদ্ধকে ভিক্ষা দিলেন—তাঁর কাছে কত উপদেশ শুনে ধন্য হলেন, নিজেদের কত দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করলেন।

সারা কপিলবস্তু নগরের মধ্যে বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করলেন না শুধু এক জন—কেন যে তা কেউ জানলো না।

তিনি—গোপা।

তেইশ

রাহুলের প্রব্রজ্যা

রাজবধূ গোপার বিলাস-ভবন এখন বৈরাগ্যের লীলানিকেতন। আর সে সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই, সে বিলাসের স্রোতও প্রবাহিত হয় না—তার বদলে এক অনাবিল শান্তি ও পবিত্র ভাবের স্রোত চলেচে সেখানে।

প্রকোষ্ঠের মাঝখানে রত্নখচিত সিংহাসনে কুমারের স্মৃতি—তাঁর পরিত্যক্ত পোষাকগুলি রেখে গোপা ফুল দিয়ে সেই সিংহাসন সাজিয়েচেন। সম্মুখে ধূপ দীপ ও পূজার অন্যান্য উপকরণ।

গেরুয়া-বসনা গোপা মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মত সে কক্ষে বিরাজ

করছেন। সে দেব-ভবনে প্রবেশ করলে অতিবড় পাষণ্ডের মনেও ভক্তিভাবের উদয় হয়।

গোপা সেদিন সেই কক্ষের মেঝেয় বসে আছেন, তাঁর একজন সহচরী এসে বললে—"আর্য্যে, এতদিন পরে কুমার এসেছেন কপিলবস্তু নগরে—বিশ্বপূজ্য ভগবান্ বুদ্ধ হয়ে। সারারাজ্যের লোক তাঁর কাছে গিয়ে কত উপদেশ, কত শিক্ষা পেলে, তাঁকে ভিক্ষা দিলে না এমন লোকই বা কপিলবস্তুতে কে রইলো? শুধু তুমিই সে দেবতার চরণ দর্শন করলে না—তাঁর অপরূপ দেব মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক করলে না। আজ তুমি তাঁকে দেখবে চল।"

গোপা বললেন—"না সখি, শুনেছি স্ত্রী সন্ন্যাসধর্ম্মের পথে বিঘ্ন। আমায় দেখলে যদি তাঁর সন্ন্যাসব্রত নষ্ট হয়, তাই আমি যাব না।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সখী বললে—"আর্য্যে, তোমার মত পবিত্রা দেবীর দর্শনেও যে ধর্ম্ম নষ্ট হয় সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। তোমার এ সন্ন্যাসিনী ব্রত কি বিফল হবে?"

গোপা বললেন—"যদি আমার ব্রত সফল হয়, তবে আমি এখানেই প্রভুর দর্শন পাবো।"

ঠিক এমনি সময় ভগবান্ বুদ্ধ সেখানে প্রবেশ করলেন—সঙ্গে সারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন।

অনিমেষ নয়নে বুদ্ধ গোপার তপস্বিনী মূর্ত্তি দেখলেন।

সন্ন্যাসিনী গোপা সন্ন্যাসী বুদ্ধের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। চোখের জলে বুদ্ধের চরণ দুখানি ভিজে গেল।

মধুর কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে ভগবান্ গোপার ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্যে খুব প্রশংসা

করে বললেন—"গোপা, আমার কাছে কি তোমার কিছু প্রার্থনা আছে ?"

গোপা হাত যোড় করে বললেন—"প্রভু, সন্ন্যাসিনীর ব্রত পালন করে, তোমার উপদেশ শুনে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবার অনুমতি দাও।"

বুদ্ধ রাজকুমারী গোপাকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের সঙ্ঘে থাকবার অনুমতি দিলেন না। তারপর রাজপুরী ত্যাগ করে বুদ্ধ চললেন আম্র-কাননে।

শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদের মত আট বছরের শিশু রাহুল তখন খেলা করছিলো। ধীরে ধীরে গোপা রাহুলকে বুকে তুলে নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন—"রাহুল, ঐ দেখ, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে যে সুন্দরমূর্ত্তি সন্ন্যাসী যাচ্চেন উনিই তোমার পিতা। সমস্ত রাজসম্পদের চেয়েও মূল্যবান্ রত্নের অধিকারী উনি। তুমি পিতার নিকট তোমার পিতৃধন চেয়ে নাও।"

ছোট্ট রাহুল রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় সন্ন্যাসীদের ভীড়ের মাঝে গিয়ে একেবারে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত।

যতই হোক ছোট্ট ছেলে, তায় সম্পূর্ণ অপরিচিত—রাহুলের কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হচ্চে। কাছে গিয়েও কিছু বলতে পারে না।

বেলা তখন বেশীই হয়েচে, মাথার উপর বেশ রৌদ্র।

রাহুল আস্তে আস্তে গিয়ে বুদ্ধের পাশে দাঁড়ালো। এতটুকু ছেলেকে পাশে দেখে ভগবান্ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই রাহুল বললে —"শ্রমণ, আপনার ছায়া বেশ শীতল, তাই একটু দাঁড়িয়েচি।"

"আমাকে আমার পিতৃধন দিন।" (পৃঃ ১০২)

মধুর হেসে বুদ্ধ তার খুব কাছে আরও ছায়া করে দাঁড়ালেন। সাহস পেয়ে রাহুল কচি কচি হাত দুখানি যোড় করে বললে—

"আমি আপনার পুত্র রাহুল, শুনেচি আপনি অমূল্য রত্নের অধিকারী। পিতা, আমাকে আমার পিতৃধন দিন।"

মুহূর্ত্তকাল বুদ্ধ নীরব হয়ে রইলেন, তার পর বললেন—"পৃথিবীর ধনরত্ন তো আমার কিছু নেই বৎস, তবে যে জ্ঞানরত্ন লাভ করেচি কিছুদিন পরে তোমায় তা দেবো। সারীপুত্র তোমার শিক্ষার ভার নিলেন আজ হতে।"

এই বলে বুদ্ধ রাহুলের হাতে ভিক্ষাপাত্র দিলেন। পিতার দেওয়া ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাহুল মহানন্দে তাঁর সঙ্গে চললো!

রাহুল,—শাক্যরাজের বংশধর শিশু রাহুলের হাতে ভিক্ষাপাত্র দেখে সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো!

প্রাসাদের বারান্দা হতে গোপা সব দেখলেন। আনন্দে তাঁর চোখ দিয়ে দর দর করে অশ্রু পড়লো। তাঁর আদরের রাহুল আজ দেব পিতার অনুগামী হয়েচে।

মহাপ্রজাবতী গৌতমীর পুত্র ছিলেন নন্দ। শাক্যকুমারী সুন্দরিকার সঙ্গে কাল তাঁর বিবাহ। রাহুলের হাতে ভিক্ষাপাত্র দেখে নন্দ বরের পোষাক খুলে ফেলে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষু হলেন।

শাক্যরাজবংশে উত্তরাধিকারী বলতে আর কেউ রইলেন না।

সব শুনে বৃদ্ধরাজা শুদ্ধোদন অতিশয় শোকাকুল হলেন। তাঁর ব্যাকুলতা বুদ্ধকেও বিচলিত করলো। তিনি নিয়ম করলেন—এখন থেকে অভিভাবকের অনুমতি না নিয়ে ছোটদের আর দীক্ষিত করবেন না।

কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ উদ্যানে বুদ্ধদেব আরও অনেকদিন ছিলেন।

তারপর একদিন কপিলবস্তু ছেড়ে যেতে মনস্থ করে বুদ্ধদেব নন্দকে বললেন—"নন্দ, পিতামাতা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের সেবা-যত্নের দরকার। যতদিন তাঁরা আছেন ততদিন তুমি ঘরে থেকে ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে তাঁদের সেবা করতে থাক।"

নন্দ বললেন—"প্রভু, অনেক দিন থেকে আশা জ্যেষ্ঠের সেবা করবো,—বুদ্ধের সেবা করবো। আমায় সে আশায় বঞ্চিত করবেন না। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার জন্যে রাজপুরীতে লোকজনের অভাব হবে না।"

তখন প্রভু রাজপুরীতে গোপাকে বললেন—"গোপা যতদিন পিতামাতা নির্ব্বাণ লাভ না করেন ততদিন তাঁদের সেবা কর।"

সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি গোপা ধীরভাবে স্বামীর আদেশ শুনলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখের একটুও রূপান্তর হল না, ললাটে একটি মাত্রও রেখাপাত হল না। শুধু নবীন ভিক্ষু রাহুলকে বললেন—"যাও বাছা, তোমার পিতার সঙ্গে যাও, তোমার প্রাপ্য ধনের অধিকারী হও।"

গোপা রাহুলকে ভগবান্ বুদ্ধের হাতে সঁপে দিলেন।

তারপর পিতামাতার নিকট বিদায় নিয়ে বুদ্ধ রাজগৃহের দিকে চললেন।

চব্বিশ

প্রচার

বুদ্ধদেব কপিলবস্তু হতে চলে গেচেন। নগরবাসীদের মনে জেগে উঠেচে এক পবিত্র ধর্ম্মভাব। কুমার সিদ্ধার্থের জন্যে আর তাদের দুঃখ নেই—তার বদলে এক পবিত্র আনন্দ তাদের হৃদয় পূর্ণ করেচে।

শাক্যবংশে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত আর ধনীর ছেলে ছিলেন আনন্দ, অনুরুদ্ধ, ভাগ্য, ভাদ্রিক, কিম্বল আর দেবদত্ত।

কপিলবস্তুতে ভগবান্ বুদ্ধের সংসর্গে তাঁদের মনে বৈরাগ্যের উদয় হলো। তাঁরা একদিন সংসার ছেড়ে চলে গেলেন বুদ্ধদেবের আশ্রয় নিতে।

বড়লোকের ছেলে—মণিমুক্তার দামী দামী গহনা ছিল এঁদের গায়ে। পথে উপালী নামে এক নাপিত এঁদের ক্ষৌরকর্ম্ম করে দিলে, তাঁরা সমস্ত গহনা এই গরীব নাপিতকে দিয়ে চলে গেলেন।

উপালী তো রীতিমত্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। "এত দামী গহনা, স্ত্রীপুত্র, ঘরবাড়ী সব ফেলে তাঁরা চললেন বুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষু হতে! তা হলে এ সবের চাইতে ভাল জিনিষ নিশ্চয়ই সেখানে পাবেন এঁরা! তবে আমিই বা ভাঙা কুঁড়ের মায়ায় এখানে পড়ে থাকি কেন?"

এই ভেবে উপালী সেই সমস্ত গহনা একখানা কাপড়ে বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে কয়লা দিয়ে বড় বড় করে লিখে দিলেন,—"যে দেখবে তারই।"

তারপর গরীব নাপিত চললেন—শাক্যকুমারদের পেছনে পেছনে—ভগবান্ তথাগতের আশ্রয়ে অমূল্য সম্পদ্ পাবেন বলে।

ভগবান্ বুদ্ধ তখন অনুপ্রিয় নগরে বিশ্রাম করছিলেন। এঁরা সাতজন সেখানে উপস্থিত হলেন।

তখন নিয়ম ছিল, কয়েকজন একসঙ্গে দীক্ষা নিতে গেলে, যিনি প্রথমে দীক্ষিত হবেন অন্যেরা তাঁকে প্রণাম করবেন। এখন এঁদের মধ্যে প্রথমে কে দীক্ষিত হবেন?

শাক্য কুমারেরা বললেন—"ভগবান্, উপালীকে আগে দীক্ষিত করুন। শাক্যবংশের আভিজাত্যের অহংকার বড় বেশী, তারা নিজেদের খুব বড় মনে করে। উপালীকে প্রণাম করে আমরা প্রথমে সেটুকু নষ্ট করতে চাই। আর গরীব উপালী সত্যই নির্লোভ—সাধু, এ জন্যে প্রথমে দীক্ষা নেবার অধিকার তারই।"

শাক্য কুমারদের ধর্ম্মনিষ্ঠায় ভগবান্ খুশি হলেন। এঁরা সাতজন সেদিন দীক্ষিত হলেন।

এঁদের মধ্যে আনন্দ আর উপালী খুব জ্ঞানী হয়েছিলেন। ভগবানের সব চেয়ে প্রিয় হয়েছিলেন এই আনন্দ।

এই সব শাক্যকুমারদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করতে দেখে সমস্ত ভারত বিস্মিত হয়েছিল—বৌদ্ধধর্ম্মের উপর লোকের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিল শতগুণে।

কয়েক দিন পথ চলার পর ভগবান্ রাজগৃহে পৌঁছলেন।

শ্রাবস্তীপুরে অতুল ধনের অধিকারী এক বণিক ছিলেন সুদত্ত। তিনি যেমন ধনী, গরীব দুঃখীদের দানও করতেন তেমনি অকাতরে। কত নিরন্ন তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হত,—তিনি ছিলেন কত অনাথ আতুরের মা-বাপ। দানশীলতার জন্যে তাঁর নামই হয়েছিল 'অনাথ-পিণ্ডদ'—অর্থাৎ অনাথের অন্নদাতা।

কাজের জন্যে রাজগৃহে এলে ভগবানের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো।

বুদ্ধের পবিত্র উপদেশ সাধু অনাথপিণ্ডদকে মুগ্ধ করলে। ধন-সম্পদ্ ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে তিনি সঙ্ঘে আশ্রয় নেবার জন্যে ভগবানের অনুমতি চাইলেন।

ভগবান্ বললেন—"সুদত্ত, সত্যই অর্থ বড় খারাপ জিনিষ। ধনসম্পদ্ মানুষের মনে অহংকার এনে দেয়, নিত্য নূতন নূতন ভোগের বাসনা জাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যায়। এই জন্যে জ্ঞানী লোকেরা ধন সম্পদ্ ত্যাগ করেন। কিন্তু অর্থের উপর যাদের আসক্তি নেই, যারা অকুণ্ঠিতচিত্তে গরীব দুঃখীদের দান করতে পারেন, যাদের টাকাকড়ি জগতের কল্যাণের জন্যে খরচ হয় তাদের তো ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করবার কোন দরকার হয় না।

দানশীল সাধুর সম্পত্তি তাকে ধর্ম্মপথে চালিত করে। তোমার সম্পত্তি ত্যাগ করবার কোনই দরকার নেই। গৃহী শিষ্য হয়ে ধর্ম্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে জগতের কল্যাণে তুমি নিজেকে বিলিয়ে দাও।"

অনাথপিণ্ডদ গৃহী শিষ্য হলেন।

ভক্ত অনাথপিণ্ডদের ভারী ইচ্ছা হলো শ্রাবস্তীপুরে ভগবান্ ও শ্রমণদের কিছুদিন ভিক্ষা দিতে।

কিন্তু এই সন্ন্যাসীসঙ্ঘ ও ভগবান্ বুদ্ধকে তিনি কোথায় রাখবেন?—সংসারের কোলাহলের মধ্যে—নিজের বাড়ীতে তো এঁদের রাখা ঠিক হবে না। ভগবানের উপযুক্ত স্থান শ্রাবস্তীপুরে কোথায়? নগরের মধ্যে রাখলে তাঁদের ধর্ম্মালোচনার ও শান্তির ব্যাঘাত হতে পারে—আবার নগর হতে খুব দূরে রাখলেও সেবা-যত্নের অসুবিধা হবে। নির্জ্জন অথচ সহরের কাছে এমন একটি জায়গা চাই—যেখানটি ভগবানের ও ভিক্ষুদের ধর্ম্ম চিন্তার অনুকূল হবে অথচ সংসারী লোকেরা অবসর মত উপদেশ শুনে ধন্য হতে পারবে। সন্ন্যাসীদের থাকবার এমন যোগ্য স্থানই বা শ্রাবস্তীতে কোথায় আছে?

ভাবতে ভাবতে অনাথপিণ্ডদের মনে পড়লো—শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠেই আছে কোশল রাজকুমার জেতের একটি সুন্দর ও প্রকাণ্ড উদ্যান।

জেতের উদ্যান বলে এর নাম হয়েছিল 'জেতবন'। সবদিক দিয়ে উপযুক্ত দেখে অনাথপিণ্ডদ এই রমণীয় উদ্যানটি রাজকুমার জেতের কাছে কিনতে চাইলেন।

জেত কিন্তু কিছুতেই দিতে রাজী হলেন না—অনেক তর্কের পর জেত

বলে বসলেন—"কোটি কার্ষাপণেও * আমি ঐ উদ্যান দিতে পারি না।"

হেসে অনাথপিণ্ডদ বললেন—"বন্ধু, জেতবন তো আমারই হয়ে গেল।"

জেত বললেন—"বাঃ, কি করে জেতবন তোমার হলো?" অনাথপিণ্ডদ বললেন—"তুমি যখন দাম করেচো, তখনই ঐ উদ্যান আমারই হয়েচে, এক কোটিতে না দাও আরও বেশী নিয়ে তোমায় জেতবন দিতে হবে।"

জেত তো বিচারকের কাছে হাজির হলেন।

সব শুনে বিচারক বললেন,—

"রাজকুমার, জেতবন আপনাকে বেচতেই হবে। আপনি মূল্যের কথা না তুললে কোন কথাই ছিল না—কিন্তু দাম যখন করেচেন তখন বিক্রয়ের কথাই বলা হয়েচে।"

জেত আর কি করবেন? শেষে তিনি একটা অসম্ভব রকমের দাম চেয়ে বসলেন।

তিনি বললেন—"অনাথপিণ্ডদ যদি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সমস্ত উদ্যান ঢেকে ফেলতে পারেন তবে ঐ স্বর্ণমুদ্রার বদলে আমি উদ্যানটি তাঁকে দিতে পারি।"

অনাথপিণ্ডদ তাতেও হটলেন না।

তাঁর আজন্ম সঞ্চিত ধনরাশি গরুর গাড়ী বোঝাই করে উদ্যানে আনা হলো।

---

* তখন স্বর্ণমুদ্রাকে কার্ষাপণ বলতো।

একটির পর একটি স্বর্ণমুদ্রা সাজিয়ে উদ্যানের অর্দ্ধেক অংশ ঢাকা পড়ে ঝক্‌মক্ করচে—খবর পেয়ে রাজকুমার জেত শ্রাবস্তীতে এলেন।

অনাথপিণ্ডদের ত্যাগ দেখে জেতের মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হলো। অনাথপিণ্ডদের হাত দুখানি ধরে তিনি বললেন—"বন্ধু, এই উদ্যান তোমারই হল। এখানে ইচ্ছামত 'বিহার'* তৈরী কর, শুধু ঐ বাকী অংশটুকু আমায় দাও আমিও ভগবানের চরণে নিবেদন করে ধন্য হই।"

তার পর ঐ সমস্ত অর্থ রাজকুমার জেত নিজে না নিয়ে সঙ্ঘে দান করলেন।

প্রকাণ্ড আটতলা প্রাসাদ তৈরী হল জেতবনে—সহস্র ভিক্ষুর থাকবার জন্যে। তারপর দানশীল অনাথপিণ্ড এই নূতন তৈরী বিহারে ভগবান্ বুদ্ধকে পরম সমাদরে নিয়ে এলেন।

তাঁর দান ভগবান্ সাদরে গ্রহণ করলেন। জেতবন বুদ্ধের বড় প্রিয় ছিল। অনেক সময় এখানে থেকে তিনি ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন।

শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ এখানেই দীক্ষিত হন। সে সময় বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, রাজা-প্রজা, দীন-দুঃখী সকলের মনের ওপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করেছিল।

একদিন বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্যে অনাথপিণ্ড ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করচেন।

ধন, ধান, তৈজস, অলঙ্কার, যার যা সাধ্য—নগরবাসীরা দিচ্চে বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্যে।

---

* সন্ন্যাসীদের থাকবার মঠের নাম 'বিহার'।

ভিক্ষা করতে করতে অনাথপিণ্ডদ এসে পড়লেন নগরের শেষপ্রান্তে। জীর্ণ-শীর্ণ ক'খানা কুঁড়ে বেঁধে কতকগুলি দুঃস্থ লোক বাস করতো এখানে। এদের নিকটেই এক গাছতলায় থাকতো—সব চেয়ে দুঃস্থা এক ভিখারিণী। দুবেলা পেটভরে খেতেও পেত না সে, ভিক্ষা করে অতিকষ্টে কোন রকমে তার দিন চলতো।

ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদ যাচ্চেন ভগবান্ বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চেয়ে। ভিখারিণী শুনলে। তার কোটরগত চোখে বাদল-ধারা নামলো—হায়, আজ যদি একমুঠো চাল-ও থাকতো তার, তাই সে ভগবনের নামে নিবেদন করে ধন্য হতো। একমুঠো চাল—অভগিনীর তাও নেই আজ! হঠাৎ কী যেন তার মনে পড়লো, ভিখারিণীর চোখ দুটি হয়ে উঠলো উজ্জ্বল, তার মনে হলো—হ্যাঁ, আছে, ভগবানকে দেওয়ার মত শেষ সম্বল এখনও তার আছে কিছু।

পাশের এক ঝোপের মধ্যে গিয়ে সে আপনাকে লুকিয়ে ফেললো, তারপর পরণের একমাত্র কাপড়খানি খুলে হাত বাড়িয়ে পথে ফেলে দিলে ভিক্ষুর সামনে।

অনাথপিণ্ডদ সমস্ত বুঝলেন,—ভিখারিণীর দান তিনি ভগবানের কাছে উপস্থিত করলেন।

সেদিনকার মণি-মাণিক্য, সোণা-রূপার অজস্র দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান পেয়েছিল ভিখারিণীর এই অতি সামান্য সর্ব্বস্ব দান।

ভিখারিণীও আর ভিখারিণী রইলো না। অনাথপিণ্ডদ তাকে নিজের মেয়ের মত যত্নে রাখলেন।

অনেকদিন শ্রাবস্তীতে থেকে ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে ফিরলেন।

কিছুদিন পরে পিতার অসুখের সংবাদ শুনে ভগবান্ কপিলবস্তুতে যান। বৃদ্ধরাজা অন্তিমে পুত্ররূপী ভগবান্ বুদ্ধকে দর্শন করে মহা-নির্ব্বাণ লাভ করলেন।

বুদ্ধ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করলেন।

কপিলবস্তুতে রাজা বলতে এখন আর কেউ নেই। অমন সুন্দর রাজপুরী মহাশ্মশানে পরিণত হলো। গৌতমী ও রাজপুরীর অন্যান্য অনাথা রমণীরা বুদ্ধের চরণে আশ্রয় নিলেন।

প্রথমে ভগবান্ সঙ্ঘের মধ্যে মেয়েদের স্থান দিতে চাননি, কিন্তু আনন্দ ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে পৃথক ভিক্ষুণীসঙ্ঘ গঠন করে তাঁদের জন্যে অনেকগুলি কঠিন নিয়ম করে দিলেন। গোপাদেবীই প্রথম ভিক্ষুণী হন। তিনিই হলেন ভিক্ষুণী সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী।

সিদ্ধার্থের ভোগবিলাসের জন্যে তৈরী সুরম্য বিলাস-ভবন বিশ্রম্ভণ প্রাসাদ—আজ বৈরাগ্যের 'বিহার' ভূমিতে পরিণত হলো।

পঁচিশ

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ

ভিক্ষুসঙ্ঘের মত ভিক্ষুণী সঙ্ঘও দিন দিন বেশ পুষ্ট হতে লাগলো।

নানা দেশ হতে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিদুষী মহিলারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন।

মেয়েদের মধ্যেও তখন সুশিক্ষার প্রচলন হয়েছিল খুব বেশী রকমেই।

মহারাজ প্রসেনজিতের কন্যা বিরূপা ছিলেন খুব কুৎসিতা। কদাকার চেহারার জন্যে সকলেই তাঁকে ঘৃণা করতো। স্বামীর কাছেও কখন আদর পান নি তিনি। মনের দুঃখে বিরূপা সবসময়েই ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতেন।

প্রসেনজিতের গৃহে ভগবান্ বিরূপার দুঃখের কথা শুনলেন। সকলের ঘৃণার পাত্রী বিরূপাকে সাদরে কাছে ডেকে বুদ্ধদেব বললেন—

"বিরূপা, রূপের জন্যে দুঃখিত হতে নেই,—রূপ তো মাত্র দুদিনের জন্যে। বাইরের রূপেই মানুষ সুন্দর হয় না,—সুন্দর হয় অন্তরের রূপে। হৃদয় যার ভাল, মন যার পবিত্র সরল, সেই সবচেয়ে সুন্দর।"

এমন স্নেহপূর্ণ কথা বিরূপা আর কারুর কাছে শোনেন নি। তিনি পরম সান্ত্বনা পেলেন। হৃদয় তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিকসিত হয়ে উঠলো, তিনি গৃহিশিষ্যা হলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্যে তাঁর স্বামীও আর কখনো তাঁকে অনাদর করেন নি।

শ্রাবস্তীর কোন বিখ্যাত নগরবাসীর পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিলেন—সুপ্রভা। তাঁর রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। একে একে পাঁচ-ছ'জন রাজকুমার তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন।

সুপ্রভার পিতা তো মহাবিপদে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে কারুর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিলেই অন্য সকলে ভয়ানক রাগ করে তাঁর সঙ্গে হয় তো বিরোধ বাধিয়ে বসবে।

কী করবেন, তিনি ঠিক করে উঠতে পারেন না।

পিতাকে চিন্তিত দেখে সুপ্রভা নিজেই স্বামী পছন্দ করবার ভার নিলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করে সেই সব কুমারদের নিমন্ত্রণ করা হলো। দামী দামী জমকালো সাজপোষাক পরে, সুসজ্জিত সভায় নির্দ্দিষ্ট আসনে সকলে বসলেন, কন্যার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে।

শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হয়ে সবাই দেখলে, হলদে কাপড় পরে, হলদে ওড়নায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে একটা অপূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত

হয়ে সুপ্রভা কুমারদের অভিবাদন করলেন, তারপর ভগবান্ বুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষুণীসজ্ঘে মিলিত হলেন।

পুণ্যবতী সুপ্রভা অর্হত্ব* লাভ করেছিলেন।

একবার ঐ রাজকুমারদের মধ্যে কয়জন যুক্তি করে আসেন, সুপ্রভাকে চুরি করে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সেই ধর্ম্মশীলা সন্ন্যাসিনীর তেজোদীপ্ত মূর্ত্তি দেখে তাঁরা সসম্ভ্রমে প্রণাম করে চলে যান।

অনাথপিণ্ডদের মেয়ে সুপ্রিয়া পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারিণী হয়েছিলেন। তিনিও সঙ্ঘের আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষুণী হন। জগতের কল্যাণকর্ম্মে পিতার মতই তাঁর হৃদয় ছিল উদার।

একবার শ্রাবস্তীতে খুব অনাবৃষ্টি হয়েচে। জলাশয়ে জল নেই, মাঠে মাঠে ফসল গেচে শুকিয়ে। লোকের ভয়ানক অন্নকষ্ট—শেষে এমন হলো যে, কেউ আর খেতে পায় না, অনাহারে লোক মারা যায় অনেক। ক্ষুধাতুর নরনারী, ছোট ছোট শিশুদের জীর্ণশীর্ণ চেহারা আর শুকনো মুখ দেখে, বুদ্ধ বড় বিচলিত হয়ে ধনী শিষ্যদের ডেকে প্রতীকার করতে বলেন।

এত বড় নগর—লোকজনও সেখানে বড় কম নয়; দুর্ভিক্ষ দূর করবার ভার নিতে অনেক বড় বড় রাজা-মহারাজারও সাহস হলো না।

শেষে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণার মত ভিক্ষাপাত্র-হাতে, গেরুয়া-বসনা সন্ন্যাসিনী সুপ্রিয়া এই গুরুতর কাজের ভার নিলেন। বড় বড় রাজা ও ধনীদের কাছে অর্থ ও খাদ্য সংগ্রহ করে, তিনি এমনি

* শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বা মোক্ষ।

সুশৃঙ্খলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হতে নগরবাসীদের রক্ষা করলেন যে, সমস্ত দেশবাসী আশ্চর্য্য হয়ে তাঁকে মাতৃরূপে পূজা করলে।

আম্রপালী ছিলেন নীচজাতীয়া নারী। নাচগান করে তিনি জীবন কাটাতেন।

ভগবান্ বুদ্ধের শিক্ষায় তাঁর জীবনের গতি একেবারে বদলে গেল। শেষ জীবনে আম্রপালী পরম ভক্তিমতী ও ধর্ম্মশীলা হয়েছিলেন।

তিনি একবার বুদ্ধকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। এই নীচজাতীয়া নারীর ভক্তি পূর্ণ নিমন্ত্রণ বুদ্ধ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

আম্রপালীর খুব সুন্দর ও বড় একটি আম্রকানন ছিল। বুদ্ধ ও সঙ্ঘকে তিনি সেটি দান করেন।

গৃহিশিষ্যা হয়ে, সৎপথে চলে আম্রপালী সারাজীবন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করেন।

এমনি করে মেয়েদের মধ্যেও ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার বিস্তার হওয়ায় সে সময়ে ঘরে ঘরে শান্তির হিল্লোল বয়েছিল।

ছাব্বিশ
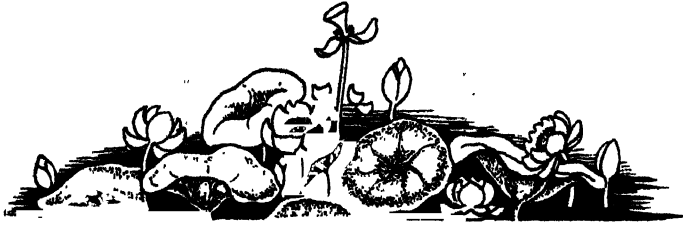
লোক-শিক্ষা

বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরে এলে দেশ-বিদেশ হতে দলে দলে লোক এলো তাঁর নবধর্ম্ম গ্রহণ করতে। তাঁর সর্ব্বদুঃখনাশা সত্য বাণী, মধুর উপদেশ ও সরল শিক্ষা-প্রণালীর গুণে, কয়েক বছরের মধ্যেই শিষ্য-সংখ্যা হলো অনেক। শিষ্যদলে রাজা-মহারাজার সংখ্যাও বড় কম ছিল না।

তাঁর শিক্ষা-প্রণালী এত সুন্দর ও সরল ছিল যে নিরক্ষর মূর্খ লোকেও সহজেই তাঁর ধর্ম্মোপদেশ বুঝতে পারতো।

একবার বেড়াতে বেড়াতে বুদ্ধ নির্জ্জন 'অলাবীবনে' উপস্থিত হয়ে এক পরিত্যক্ত কুটীরে সমাধি-মগ্ন হন।

ঐ কুটীর ছিল নরহন্তা দস্যু অলবকের। নির্জ্জন বনে পথিকদের মেরে তাদের ধনরত্ন লুঠ করে নেওয়াই ছিল তার কাজ। দূর হতে মানুষ দেখে সে মুগুর-হাতে ছুটে এলো। কিন্তু সেই জ্যোতির্ম্ময়

শিষ্য-সংখ্যা হলো অনেক। (১১৬ পৃঃ)

দেবমূর্ত্তি দেখে নরহন্তা দস্যুর মনে কী ভাব হলো তা কে জানে? স্তব্ধ হয়ে তাঁর ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কতক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হলে বুদ্ধ দস্যুর মুখের দিকে চাইলেন।

কর্কশ কণ্ঠে দস্যু বললে—"তোমায় দেখে মনে হচ্চে তুমি সাধু। যদি বলতে পার, কী করলে সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে মানুষ খুব সুখী হতে পারে, তা হলে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।"

করুণার হাসি হেসে বুদ্ধ বললেন—"দস্যু, তুমি তো অনেক জীব-হত্যা করেচ—কিন্তু প্রকৃত সুখ পেয়েচ কি? আমায় হত্যা করলেই কি তুমি সুখী হবে?"

চুপ করে অনেকক্ষণ দস্যু ভাবলে। অতীত জীবনের সব ঘটনা তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। কত হত্যা, কত রক্তপাতই না করেচে সে, সাত-রাজার-ধন এসেচে তার হাতে, কিন্তু কই, সুখী তো সে হয় নি! নিত্যই নূতন নূতন অভাব-অভিযোগের মধ্যে চলতে হচ্চে তাকে।

নিঃশ্বাস ফেলে অলবক বললে—"সত্যই তো সুখ হয় না কিছু। যদি সত্যই সুখী হতাম তবে রোজ রোজ আরও বেশী পাওয়ার জন্যে আশা হবে কেন? অভাবের তীব্র যাতনাই বা ভোগ করি কেন?"

তখন বুদ্ধ বললেন—"ভাই দস্যু, সত্যই তাই। মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন ধর্ম্ম ও জ্ঞান। সে ধন থাকলে অন্য কিছুর অভাববোধ থাকে না,—মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারে।"

অনুতাপে দস্যুর চোখে জল এল, তার কণ্ঠ হয়ে এল রুদ্ধ।

বুদ্ধের পদতলে লুটিয়ে পড়ে অলবক বললে—"প্রভু, আপনি

মহাপুরুষ। অনেক পাপ করেচি আমি সে পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় আপনাকে করতেই হবে।”

এই বলে সে খুব কাঁদতে লাগলো।

ভগবান্ বুদ্ধ প্রবোধ দিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন

নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে অলবক ভিক্ষু হলো।

এক স্বর্ণকার শিষ্য ছিলেন বড় সৌন্দর্য্যপ্রিয়। সুন্দর কিছু দেখলেই তাঁর ভারী লোভ হতো। সারীপুত্র চেষ্টা করছিলেন অনেক, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সৌন্দর্য্যস্পৃহা দূর হলো না। ভগবান্ বুদ্ধ খুব সুন্দর সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে তাঁকে রাখলেন আপনার কাছে। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বেড়াতে গেলেন পদ্মদীঘির ধারে।

পদ্মদীঘির কালো জলের ছোট ছোট ঢেউগুলি অজস্র পদ্মফুলদের দোল দিয়ে খেলা করচে,—বড় বড় সবুজ পাতাগুলি জড়াজড়ি হয়ে ভাসচে জলের ওপর; তাদের ফাঁকে ফাঁকে মাথা ঠেলা দিয়ে উঁকি দিচ্চে সবুজ সবুজ কুঁড়িগুলি।

মুগ্ধ হয়ে স্বর্ণকার শিষ্য বলে উঠলেন—“কী চমৎকার! কী সুন্দর ফুলগুলি!”

ভগবান্ বুদ্ধ তাঁকে বললেন—“বৎস, ঐ ফুলগুলির দিকে সমস্ত দিন চেয়ে থাক।”

প্রভুর আদেশমত স্বর্ণকার শিষ্য ফুলের সৌন্দর্য্য দেখচেন। যতই বেলা শেষ হয়ে আসে, ফুলগুলিও হয় ততই ম্লান। তারপর যখন দিনের শেষ আলোটুকু আকাশের কোল থেকে মুছে গেল, ফুলগুলিও

তখন ঝরে পড়েচে। এখন কোথায় বা তার সেই চোখ-জুড়ানো রঙ, আর কোথায় বা সেই মন-ভোলানো সৌন্দর্য্য! নিমেষের মধ্যেই সব শেষ!

দেখতে দেখতে স্বর্ণকার শিষ্যের জ্ঞান হলো। ছুটে গিয়ে বুদ্ধের চরণে পড়ে তিনি বললেন—"প্রভু, বুঝেচি এই ফুলগুলির মতই রূপ ও সৌন্দর্য্য দুদিনের। অল্পক্ষণের জন্যেই তারা মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারে। আর আমি রূপের পিছনে ঘুরবো না।"

এর পরে তিনি পরম জ্ঞানী ভিক্ষু হন।

একবার দুই ভাই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মঠে থাকতেন। বড় ভাই ছিলেন যেমন বুদ্ধিমান্—ছোট ভাই ছিলেন তেমনি বোকা। ছয়মাসেও ছোট ভাই একটি শ্লোক মুখস্থ করতে পারেন নি। বড় ভাই তো রেগে তাঁকে মঠ থেকে দূর করে দিলেন।

বিষণ্ণমুখে ছোট ভাই মঠ ছেড়ে চলে যাচ্চেন—পথে ভগবান্ বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর দেখা। প্রণাম করে বিদায় চাইতেই বুদ্ধ তাঁর চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

শিষ্য বললেন—"প্রভু, ছয় মাসেও একটা শ্লোক মুখস্থ করতে পারি নি। দাদা বললেন—আমার কিছু হবে না, তাই তাঁর কথায় মঠ ছেড়ে চলে যাচ্চি।"

সস্নেহবাক্যে বুদ্ধ বললেন—"বৎস, শ্লোক মুখস্থ না হলে কি ধর্ম্মাচরণ হয় না? ভাইয়ের কথায় মঠ ছেড়ে যাবে কেন? এস, তুমি আমার কাছে থাক্‌বে।"

একদিন বুদ্ধ তাঁকে একখণ্ড সাদা কাপড় দিয়ে বললেন—"তুমি দু'হাতে এটি ঘসতে থাক আর বল—আমার চিত্তের সমস্ত ময়লা দূর হয়ে যাক।"

শিষ্য তাঁর আদেশ পালন করলেন। কিছুক্ষণ ঘসতে ঘসতেই পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড মলিন হয়ে গেল। শিষ্য ভাবলেন, এ কী হলো? এখনি তো কাপড়টি ছিল দুধের মত ধব্‌ধবে। এরই মধ্যে এর শুভ্রতা গেল কোথায়?

ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হলো—"তা হলে তো সব কিছুই এই কাপড়ের শুভ্রতার মত নষ্ট হয়ে যায়—সব কিছুই তো এমনিই অসার অনিত্য।"

তাঁর মনে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হলো। স্থূলবুদ্ধি শিষ্য পরম জ্ঞানী অর্হৎ* হলেন।

একবার বৈশালীর এক বিখ্যাত সুন্দরী নর্ত্তকীর মৃত্যু হলে তথাগত তার মৃতদেহ এক প্রাসাদে রেখে শিষ্যদের বললেন—"তোমরা রোজ ঐ মেয়েটির রূপরাশি দেখবে।"

শিষ্যগণ ও অন্যান্য নগরবাসীরা রোজই দেখতে যেতেন ঐ অতুল রূপবতী নর্ত্তকীর দেহ।

একদিন, দুদিন, তিনদিন গেল—। মৃতদেহ পচে উঠলো, গলিত শবে অসংখ্য ক্রিমি জন্মালো। সে বীভৎস দৃশ্য আর কেউ দেখতে

* অর্হৎ—মুক্ত পুরুষ। শ্রমণ, ভিক্ষু, অর্হৎ, স্থবির এই সব বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের উপাধি।

পারে না—দুর্গন্ধে কেউ কাছেও যায় না। রূপের কি শোচনীয় পরিণাম তা সবাই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে।

অজ্ঞান, অহংকার, তাদের মন থেকে আপনা আপনি দূর হয়ে গেল।

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সবাই একবাক্যে বললেন—"জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ দুঃখের হাত হতে নিস্তার পাওয়ার উপায়—'ত্রিশরণ'।"†

সকলে সমস্বরে গাইলেন—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

ভগবান্ বুদ্ধের সহজ শিক্ষার গুণে সাধারণ অশিক্ষিতদের মনেও ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধার ভাব এসেছিলো। ত্রিশরণের প্রভাবে—যেন আপনাআপনিই লোকের মন থেকে রাগ, লোভ, এই সব কু-ভাবগুলো দূর হয়ে গেল।

একবার অগ্রাণের শেষে নূতন ফসলের নানারকম খাবার নিয়ে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে মহারাজ প্রসেনজিৎ যাচ্ছিলেন বুদ্ধদেবের পূজা করতে। সুদাস নামে এক গরীব মালী পথে ফুল বিক্রী করছিলো। তার নানান ফুলের মধ্যে ছিল একটি শ্বেত শতদল। অসময়ে পদ্ম দেখে রাজা খুশি হয়ে, ভগবানের পায়ে অর্ঘ্য দেবেন বলে ওটি কিনতে গেলেন। এদিকে আর এক ধনী শিষ্য ঠিক ঐ সময়েই এলেন ঐ ফুলটি কিনতে।

† বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ বৌদ্ধশাস্ত্রে এই তিনের আশ্রয় নেওয়াই হলো ত্রিশরণ।

"একটু পায়ের ধূলো,—আর কিছু না" (১২৪ পৃঃ)

রাজা আর সেই শিষ্য—দুজনে তো খুবই আড়াআড়ি চললো ফুলটি নেবার জন্যে। একজন বলেন—"পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা দিচ্চি, আমায় দাও"; আর একজন বলেন, "আমি দিচ্চি দশ স্বর্ণমুদ্রা"।

এমনি করে দাম উঠলো—সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। হতভম্ব মালী তখন কাকে দেবে কিছুই বুঝতে পারচে না।

শেষে সে ভাবলে—"যাঁকে দেবার জন্যে এঁরা একটা মাত্র ফুলের জন্যে এত করচেন আমি তাঁকেই দিই না।"

এই ভেবে সে হাতযোড় করে বললে—"মহারাজ, আমি ফুল বিক্রী করবো না।"

তারপর ফুলটি নিয়ে সে গেল ভগবান্ বুদ্ধের কাছে। ভক্তিভরে তাঁর চরণে ফুলটি রেখে সে প্রণাম করলো।

আশীর্ব্বাদ করে স্নেহমাখা-কণ্ঠে ভগবান্ বললেন—"কী চাই তোমার?"

চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সুদাস বললে—"প্রভু, একটু পায়ের ধূলো,—আর কিছু না—।"

ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁর সব দুঃখ দূর হলো। সুদাস উপাসক হয়ে নিজের নাম সার্থক করলে।

গরীব সুদাসের ধর্ম্মনিষ্ঠা সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভকেও জয় করলে।

পরমানন্দে সুদাস গাইলো—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"
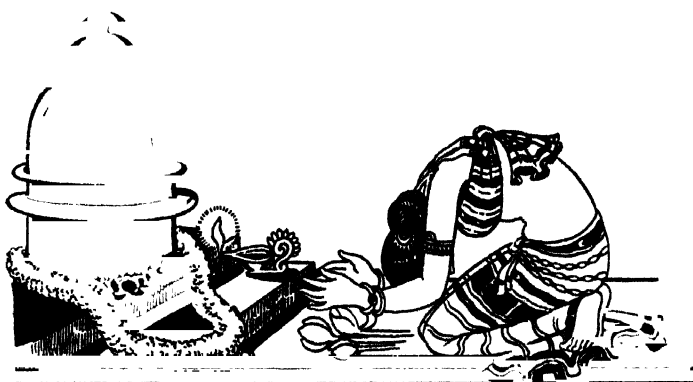
সাতাশ

দেবদত্ত-অজাতশত্রু

অনেকদিন পরে বুদ্ধদেব কৌশাম্বীতে যান।

কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন এবং তাঁর ছেলে রাষ্ট্রপাল তাঁর নিকট দীক্ষিত হলেন।

কৌশাম্বী হতে ফিরে বেশীর ভাগ তিনি রাজগৃহেই থাকতেন।

ছোট বেলা হতেই দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ভিক্ষু হয়েও সে বিরোধী ভাব তাঁর মন থেকে দূর হয়নি।

বুদ্ধের খ্যাতি, সম্মান দেখে তাঁর মনে হিংসার উদয় হলো। সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে নানারকম প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা তিনিই সঙ্ঘের পরিচালক হন।

ভিক্ষুরা তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হতেন।

একদিন দেবদত্ত বুদ্ধকে বললেন—"আপনার অনেক বয়স হয়েচে—

সঙ্ঘ-পরিচালনার ক্ষমতা আপনার কম হয়ে আসচে, এর কর্ত্তৃত্ব আমার ওপর দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানানুশীলন করতে থাকুন।”

শান্তস্বরে ভগবান্ বললেন—“দেবদত্ত, যতদিন আমি আছি ততদিন সঙ্ঘের জন্যে তোমার চিন্তিত হবার কারণ নেই। ধর্ম্মশীল ও সৎ হয়ে তুমি পবিত্র জীবন যাপন করতে থাক।”

খলের স্বভাব সহজে বদলাবার নয়। মুখে কিছু না বললেও দেবদত্ত মনে মনে হিংসায় জ্বলতে থাকেন।

অজাতশত্রু ছিলেন মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র। দেবদত্ত ভাবলেন—অজাতশত্রুকে বশে আনতে পারলে বুদ্ধের ওপর তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারেন।

অনেক কৌশলে,—কত তোষামোদ করে, যুবরাজ অজাতশত্রুকে দেবদত্ত হস্তগত করলেন। তাঁর কুচক্রে পিতাকে হত্যা করে অজাত-শত্রু নিজে রাজা হওয়ার মতলব করলেন।

বিম্বিসারের বিচক্ষণ মন্ত্রীরা কুমারের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে রাজাকে সব বললেন।

বিম্বিসার তো প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র—সে কী তাঁকে হত্যা করবার ইচ্ছা করতে পারে? এও কী সম্ভব? শেষে নিজেই পুত্রকে ডেকে ষড়যন্ত্রের কথা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

উদ্ধত অজাতশত্রু অস্বীকার করলেন না। অকুণ্ঠিতচিত্তে তিনি বললেন—“সিংহাসনের লোভে আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েচি।”

পরদিনেই ধূমধামের সঙ্গে রাজমুকুট মাথায় পরিয়ে, রাজদণ্ড হাতে দিয়ে বিম্বিসার অজাতশত্রুকে সিংহাসনে বসালেন।

তাতেও তিনি কিন্তু নিস্তার পেলেন না। দেবদত্তের কুপরামর্শে অজাতশত্রু পিতাকে বন্দী করলেন, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিনা দোষে প্রাণদণ্ড করলেন, আর—নগরে ঘোষণা করে দিলেন যে, কেউ বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে না, বা তার পিতার তৈরী বৌদ্ধ-স্তূপে কেউ পূজা করতে পারবে না। আদেশ অমান্য করলে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। অনেকেই প্রাণ দিয়েছিল, কিন্তু ধর্ম্মত্যাগ করে নাই।

সে সময় রাজপ্রাসাদে থাকতো শ্রীমতী নামে এক ভক্তিমতী দাসী।

অজাতশত্রুর ভয়ে কেউ স্তূপে পূজা দিতে যায় না, সে দেবস্থান কেউ পরিষ্কার করে না, সন্ধ্যারতির প্রদীপও আর সেখানে জ্বলে না।

পুষ্পপাত্র হাতে নিয়ে—আরতির প্রদীপ সাজিয়ে দাসী শ্রীমতী গেল স্তূপের কাছে। তারপর স্তূপবেদিকা পরিষ্কার করে, ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, প্রদীপ জেলে প্রণাম করে, ভগবান্ বুদ্ধের স্তবগান করতে করতে দাসী ফিরে গেল প্রাসাদে।

রাজার কাছে কিছুই অগোচর রইলো না। শ্রীমতীর প্রাণদণ্ড হলো। হাসিমুখে বিনা-প্রতিবাদে দাসী শ্রীমতী বরণ করে নিলে মৃত্যুকে।

অধার্ম্মিক রাজার আশ্রয়ের চেয়ে ধর্ম্মের আশ্রয়ে জীবন দেওয়াই সে শ্রেয় বলে মনে করলে।

রাজপ্রাসাদে অজাতশত্রু হলেন বৌদ্ধদের শত্রু,—এদিকে সঙ্ঘের

মধ্যে দেবদত্ত গোপনে গোপনে চেষ্টা করতে লাগলেন বুদ্ধের জীবন নাশ করবার।

দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু একদিন গুপ্তঘাতকদের পাঠিয়ে দিলেন—বুদ্ধের প্রাণ বিনাশের জন্যে।

কিন্তু সেই দেবতার দেহে অস্ত্রাঘাত করতে পাষণ্ডদেরও বুক কেঁপে উঠলো,—চিরজীবনের মত ঘাতকেরা নিষ্ঠুর কাজ ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলে।

বুদ্ধ একদিন ভিক্ষায় বেরিয়েচেন—নগরের রাজপথে, ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে সেই দিকে ছুটে এলো এক প্রকাণ্ড পাগলা হাতী। মুহূর্ত্ত মধ্যে হাহাকার উঠলো—হাতী বুঝি বা মহাশ্রমণকে পিষে ফেলে!

কিন্তু কী আশ্চর্য্য! ভগবান্ বুদ্ধের কাছে এসে তার পাগলামি কোথায় গেল! শান্ত হয়ে হাতীটি শুঁড় দিয়ে বুদ্ধের চরণ স্পর্শ করে চলে গেল রাজবাড়ীর হাতীশালার দিকে।

বুদ্ধ বুঝতে পারলেন, দেবদত্তের প্রলোভনে মাহুতেরা মদ খাইয়ে রাজহস্তী নালাগিরিকে পাঠিয়েছিল তাঁকে মারবার জন্যে।

যতই বিফল হন, দেবদত্তের আক্রোশ ততই বেড়ে ওঠে।

তাঁর কোন কথাই ভগবান্ বুদ্ধের অজানা ছিল না—তবু তাঁর সমস্ত দোষ ক্ষমা করে বুদ্ধ তাঁকে সৎপথে আনবার চেষ্টা করেন।

শেষে একদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে বুদ্ধ যাচ্চেন গৃধ্রকূট পাহাড়ের পাশ দিয়ে, দেবদত্ত চুপি চুপি উঠেচেন পাহাড়ের চূড়ায় এক

ঝোপের আড়ালে। তারপর তিনি প্রকাণ্ড এক পাথর গড়িয়ে দিলেন বুদ্ধের মস্তক লক্ষ্য করে।

শান্ত হয়ে হাতিটি শুঁড় দিয়ে বুদ্ধের চরণ স্পর্শ করে চলে গেল (১২৮ পৃ)

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাথরটা লাগলো গিয়ে বুদ্ধের পায়ে, আঙ্গুল কেটে রক্তপাত হলো—অনেকখানি।

ভয়ে দেবদত্ত গেলেন সঙ্ঘ থেকে পালিয়ে। তারপর নিজে শিষ্য সংগ্রহ করে, দল বেঁধে, বুদ্ধের নামে অনেক কুৎসা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে মহারাজ বিম্বিসার পাথরের দেয়ালে-ঘেরা অন্ধকার কারাগারে বন্দী।

অনাহারে তাঁর শরীর হয়ে এলো দুর্ব্বল, তবু ভগবান্ বুদ্ধের চরণে মন রেখে দিনরাত পুত্রের সুমতির কামনা করে—সমস্ত কষ্ট সহ্য করে যেতেন।

একদিন তাঁর সব কষ্টের অবসান হলো। যেদিন আনন্দ-কোলাহল ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অজাতশত্রুর পুত্রের জন্ম হয়—সেইদিনই ঘাতকের অস্ত্রে অন্ধকার কারাগারে পাথরের মেঝেয়—বৃদ্ধ রাজা বিম্বিসারের ছিন্নশির লুটিয়ে পড়লো।

পুত্র-জন্মের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি রাজা অজাতশত্রু পিতার দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করলেন।

কিন্তু আর সময় ছিল না—মহারাজ বিম্বিসার তখন রাজ-রাজেশ্বরেরও আদেশ-জারির বাইরে।

পাষণ্ড অজাতশত্রুর ভারী দুঃখ হলো।

তারপর যেদিন বিম্বিসারের বিধবা রাণী বৈদেহী অজাতশত্রুর নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করলেন—"মহারাজা বিম্বিসার যেমন তোমার বাবাকে ভালবাসতেন,—তোমার বাবার কাছে তুমি যেন তেমনি স্নেহ পাও"—সেদিন অজাতশত্রু আপনাকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। শিশুর মত ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

অনুতাপের আগুনে অজাতশত্রু দিনরাত পুড়তে থাকেন। শেষে ভীষণ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি চিকিৎসক জীবকের শরণ নিলেন।

সমস্ত দেখে-শুনে জীবক বললেন—"মহারাজ, এ ব্যাধির হাত হতে আপনাকে মুক্ত করতে পারবেন—একমাত্র ভগবান্ বুদ্ধ। তিনি ছাড়া আর কেউ এর চিকিৎসা জানেন না।

জীবকের উপদেশ অজাতশত্রু অবজ্ঞা করলেন না। অনুতপ্ত হৃদয়ে বুদ্ধের চরণে পড়ে তিনি নিজের সমস্ত দুষ্কর্ম্মের জন্যে ক্ষমা চাইলেন।

বুদ্ধের উপদেশে তাঁর সমস্ত সন্তাপ দূর হয়। দেবদত্তকেই সমস্ত নষ্টের মূল জেনে অজাতশত্রু তাঁর ওপর ভয়ানক বিরক্ত হলেন। রাজবাড়ী থেকে তাঁর পাঁচশত শিষ্যের জন্যে যে খাবার যেতো তা বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ লোকেও দেবদত্তের ওপর এত বিরক্ত হলো যে, একদিন তো জনকতক লোক তাঁর ভিক্ষাপাত্র কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গেই দিলে।

বেগতিক দেখে দেবদত্ত বুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন—"আমি আপনার সঙ্ঘে যোগ দিতে চাই, কিন্তু আপনাকে গোটাকতক নূতন নিয়ম ভিক্ষুদের জন্যে করতে হবে। সন্ন্যাসী হয়েও আপনার সঙ্ঘের ভিক্ষুরা তিনখানা করে 'চীবর'* পরে, এখন থেকে ওরা শ্মশানে ফেলে-দেওয়া কাপড় ছাড়া আর কিছু পরবে না। আপনি বলেন, "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—কিন্তু ভিক্ষুরা মাংস খায়, এটা ঠিক নয়, তারা মাংস খেতে পারবে না,—আর তাদের গাছতলায় থাকতে হবে।"

একটু হেসে বুদ্ধ বললেন—"দেবদত্ত, সঙ্ঘের জন্যে এসব নিয়ম আমি করতে পারবো না। শিষ্যদের বেশীর ভাগই সম্ভ্রান্ত ঘরের

* কাপড়। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের তিনখানা করে কাপড় পরতে হয়—সেগুলিকে বলে "ত্রিচীবর"।

ছেলে, শ্মশানের কুড়ানো কাপড় তারা পরতে পারবে না। তাছাড়া বস্ত্রদান না নিলে গৃহীদের দানধর্ম্মের ব্যাঘাত হবে।

সন্ন্যাসীদের ভিক্ষাই জীবিকা যখন, তখন তাদের খাদ্যবিচার চলবে না। ভক্তরা শ্রদ্ধা করে যা দেবে তাই তাদের পরিতোষের সঙ্গে খেতে হবে। যদি কেউ মাংস ভিক্ষা দেয়, তা ফিরিয়ে দিলে দাতার মনে কষ্ট হবে। মাংস খেলেই কিছু জীবহিংসা করা হয় না। 'তারই জন্যে জীবহত্যা করা হয়েচে' একথা যদি কোন ভিক্ষু না জানে, না শোনে বা চিন্তাও না করে, তাহলে জীবহত্যার জন্যে সে দায়ী হলো কেমন করে? আর এরকম মাংস খেলেই বা তার হিংসার পরিচয় পাওয়া গেল কিসে? তাছাড়া দেশভেদে জাতিভেদে যখন খাদ্যেরও নানা-রকম পার্থক্য দেখা যায়, তখন 'এখাদ্য খাবে না' 'ও খাদ্য খাবে' এরকম নিয়ম করা ভিক্ষুর পক্ষে উচিতই নয়।

তারপরে বছরের সব সময়ে গাছতলায় থাকা অসম্ভব। বর্ষা, শীত এসব সময়ে গাছতলায় থাকলে শরীর অসুস্থ হবে। তারপর শরীর নিয়েই যদি ব্যস্ত হতে হয়, তো তাঁরা ধর্ম্মচিন্তা করবেন কখন? সুতরাং কোন নূতন নিয়মই আমি সঙ্ঘের জন্যে করতে পারি না।"

অনুরোধ রইলো না দেখে দেবদত্ত খুব রেগে গিয়ে সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিফল হয়ে রাজগৃহ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন শ্রাবস্তীতে। তাঁর কুকীর্ত্তি তখন দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েচে। রাজা প্রসেনজিৎ তো ঘৃণায় তাঁর সঙ্গে দেখাই করলেন না।

ক্ষুণ্নমনে দেবদত্ত কপিলবস্তুতে ফিরে গিয়ে দেখেন, সেখানকার অবস্থা আরও ভয়ানক।

বুদ্ধের সঙ্গে শত্রুতার খবর পেয়ে শাক্যবংশের লোকেরা তো তাঁর ওপরে রেগেই ছিলেন। তারপরে আবার যেদিন দেবদত্ত গোপাকে অপমানিতা করবার চেষ্টা করলেন, সেদিন তাঁরা তাঁকে বন্দী করে বিচারের জন্যে নিয়ে গেলেন ভগবান্ বুদ্ধের কাছে।

রাগে দেবদত্ত মরিয়া হয়ে উঠেচেন।

স্বহস্তে বুদ্ধকে মেরে ফেলবার জন্যে তিনি হাতের নখে মাখিয়ে রাখলেন তীব্র বিষ।

তারপর অনুতাপের ভান করে বুদ্ধের চরণে ধরে যেমন আঁচড় কেটে রক্তের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিতে যাবেন—অমনি একটু ঠেল দিয়ে বুদ্ধ পা সরিয়ে নিলেন।

এত পাপের ভার বুঝি পৃথিবী আর সইতে পারলেন না। হঠাৎ ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গর্জ্জন করে মাটী চৌচির হয়ে ফেটে গেল—ফাটল হতে লেলিহান অগ্নিশিখা বেরিয়ে মহাপাপী দেবদত্তকে চিরদিনের মত গ্রাস করলে।

অনেকদিন পরে, অজাতশত্রুর ছেলে তখন বেশ বড় হয়েছেন,—একবার বিবাদ বিসংবাদ করে অজাতশত্রু শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত ধ্বংস করে দিলেন।

প্রসেনজিৎও সহজে হটবার নন। তিনি নূতন উৎসাহে বিপুল সৈন্যদল সংগ্রহ করলেন, তারপর ভীষণ যুদ্ধে অজাতশত্রুকে পরাজিত ও বন্দী করেন।

বন্দী অজাতশত্রু প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণের আশঙ্কা করছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধভক্ত প্রসেনজিতের উদ্দেশ্য ছিল সাধু। বুদ্ধ তখন শ্রাবস্তীর জেতবনে।

প্রসেনজিৎ বন্দী অজাতশত্রুকে নিয়ে গেলেন সেখানে। বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে তিনি বললেন—"প্রভু, মহারাজ অজাতশত্রু আজ আমার হাতে বন্দী। এঁর প্রতি আমার মনে কোন বৈরিভাব না থাকলেও এই দুর্দ্দান্ত রাজা সব সময়েই আমার শত্রুতা করেন। এঁর পিতা সদাশয় বিম্বিসার ছিলেন আমার পরম সুহৃৎ। আমি এঁকে মুক্তি দিতে চাই কিন্তু এঁর দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিকে হত্যা করে।"

ভগবান্ হাসলেন।

বন্ধন-মুক্ত হয়ে রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে বসলেন, পাশেই রাজা প্রসেনজিৎ।

ভগবান্ তাঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন—"তোমাদের বৈরিভাব দূর হোক।" তারপর বললেন—"জয় এবং পরাজয় দুটোই বড় খারাপ। জয়ীর মনে পরাজিতের উপর ঘৃণা জন্মায়, আর পরাজিতের মনে ভীষণ দুঃখ ও জয়ীর উপর হিংসা জন্মায়। অন্যকে অপমান করলে অন্যের কাছে অপমানিত হতে হয়, অপরের উপর রাগ করলে অপরেও তোমার উপর রাগ করবে। এই জন্যে জয় পরাজয় দু'টো জিনিষকেই জ্ঞানী লোকে এড়িয়ে চলেন।

তোমরা পরস্পরের মিত্র হও, পরস্পরকে ভালবাস, প্রেমের পবিত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হও,—তোমাদের জীবন পূর্ণ হয়ে উঠবে। ধর্ম্মসাধনার গোড়াতেই হচ্ছে প্রেম ভালবাসা। সকলকে ভালবাসতে শেখ, সকলের মঙ্গলকামনায় তোমাদের চিত্ত পূর্ণ কর।

দৃষ্টির ভেতরে হোক আর বাইরে হোক, দূরেই থাক বা বা কাছেই থাক, একালেরই হোক বা সেকালেরই হোক, যে কোন প্রাণী হোক না কেন—সকলেই সুখী হোক, সকলেরই কল্যাণ হোক, তোমরা এই মৈত্রীভাব সবসময়ে মনে রাখবে।

এই ভাবে তোমাদের জীবন শান্তিময় মধুময় হয়ে উঠবে।"

সেদিন থেকে অজাতশত্রুর আমূল পরিবর্তন হলো। চোখের জলে তাঁর বুক ভিজে গেল, প্রসেনজিৎকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন—"আজ হতে আপনি আমার বন্ধু, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।"

এর পরে প্রসেনজিতের কন্যা ক্ষেমাদেবীর সঙ্গে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়ে অজাতশত্রু এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করেন।

এই ধর্মের প্রভাবে কিছুদিনের মধ্যেই অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে ভ্রাতৃত্বের প্রেমময় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতে সে যেন এক মৈত্রীযুগ।

আটাশ

চুন্দ-অবদান

ধর্ম্মপ্রচারে পঁয়তাল্লিশ বৎসর কেটে গেল।

কাশী, কোশল, কৌশাম্বী, মগধ, পঞ্চনদ, সুদূর দাক্ষিণাত্যেও এই সুপবিত্র ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করেচে।

ভগবান বুদ্ধের বয়স এখন আশী বছর। আগেই গোপা ও রাহুল নির্ব্বাণ লাভ করেচেন।

কৌশাম্বীয় মুকুল পর্ব্বতে থাকবার সময়ে একদিন বুদ্ধ আনন্দকে বললেন—"আনন্দ, এবার আমার কর্ম্ম সমাপ্ত হয়েচে, এই জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে এইবার আমি মহানির্ব্বাণ লাভ করবো।"

পরম ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য আনন্দ বড় ব্যথিত হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছলছল চোখে তিনি বললেন—"প্রভু, এর মধ্যেই

আমাদের ছেড়ে যাবেন? আপনি নির্ব্বাণ লাভ করলে সঙ্ঘ পরিচালিত করবেন কে?”

স্নেহ মধুর কণ্ঠে প্রভু বললেন—“আনন্দ আমার যা করবার ছিল সমস্ত করেচি—যা দেওয়ার ছিল সবই দিয়েচি। এবার আমার সব শেষ হয়েচে। আর এই জরাজীর্ণ দেহে সঙ্ঘেরই বা কি কাজ হবে?

সঙ্ঘ রক্ষার জন্যে আর কিছু বাঁধা-ধরা নিয়ম-কানুনের প্রয়োজন হবে না। যে সত্যধর্ম্ম তোমাদের শিক্ষা দিয়েচি, তাই আমার অবিনশ্বর দেহ হয়ে সঙ্ঘ রক্ষা করবে। তোমরা সকলে পবিত্রভাবে অন্তরের সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করে যাও—সঙ্ঘ আপনিই থাকবে। তোমরা নিজেই নিজেদের প্রদীপ হও, তোমরা 'আত্মদীপ' হও—তোমাদের জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়ে যাবে।”

ভগবানের নির্ব্বাণের কথা শুনে শোকত্যাগী ভিক্ষুদের চোখেও অশ্রুর বন্যা বয়ে গেল।

বুদ্ধদেব বললেন—“প্রিয় শিষ্যগণ, সকলেই তো জান যে সংযোগ হলেই বিয়োগ হয়, জন্ম হলেই মৃত্যু হয়, মৃত্যুর হাত থেকে কেউই নিস্তার পায় না। জন্ম তো মৃত্যুর জন্যেই, যৌবন জরার জন্যেই, সংযোগ বিয়োগের জন্যেই। যা ধ্বংসশীল তার ধ্বংস তো হবেই, তবে তোমরা মিছামিছি শোক করচো কেন? শোকগ্রস্তের নির্ব্বাণে অধিকার হয় না; তোমরা শোক পরিত্যাগ কর।”

তারপর অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বুদ্ধ আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

কৌশাম্বী হতে কিছুদূরে কুশীনগর। এখানকার উপপত্তনে মল্লদের

শালবন বড় সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ। তথাগত এই শালবনে সমাধিস্থ হয়ে নির্ব্বাণ লাভ করতে মনস্থ করলেন।

কুশীনগরের পথে যেতে যেতে 'পাবা' নামে একগ্রামে বুদ্ধদেব চুন্দ কর্ম্মকারের অতিথি হলেন।

অনেকদিন থেকে প্রভু বুদ্ধের কথা শুনে চুন্দের মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল। তার বড় আশা, একটি দিনের জন্যেও স্বহস্তে প্রভুর সেবা করে।

অনেকদিনের সঞ্চিত আশা পূর্ণ হতে চলেচে, আজ চুন্দের আনন্দ দেখে কে? মহা উৎসাহে সে নানা রকম খাবার তৈরী করলে—পরম যত্নে শূকরের মাংস রান্না করলে ভগবান্‌কে ভিক্ষা দেবে বলে।

ভক্তের শ্রদ্ধার দান বুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। অন্যান্য ভিক্ষুদের মাংস দিতে নিষেধ করে তিনি নিজে মাংসান্ন ভক্ষণ করলেন।

বিশ্রামান্তে আবার যাত্রা সুরু হলো। মাংসান্ন খাওয়ার ফলে বুদ্ধদেব রোগে আক্রান্ত হলেন।

পথে শ্রান্ত হয়ে বুদ্ধ বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করলে, আনন্দ তাঁর উত্তরীয় খানি চার ভাঁজ করে এক গাছতলায় পেতে দিলেন। তারপর শীতল বারিতে তৃষ্ণা দূর করে বুদ্ধ একটু বিশ্রাম করচেন, এমন সময়ে পুক্কস নামে আড়ার কালামের এক শিষ্য এসে উপস্থিত হলেন সেই জায়গায়।

বুদ্ধের আশ্চর্য্য ধ্যানশক্তির কথা শুনে তিনি তাঁর কাছে দীক্ষিত হলেন।

পুক্কস তাঁকে দুখানি সুন্দর সোণালী রংএর পোষাক উপহার দেন। বুদ্ধের আদেশে তিনি স্বহস্তে একখানি তাঁকে ও একখানি আনন্দকে পরিয়ে দিলেন।

কয়েকদিন পরে বুদ্ধ কুশীনগরে উপস্থিত হন।

উনত্রিশ

পরিনির্ব্বাণ

বৈশাখী পূর্ণিমা।

চুম্‌কির কাজ-করা নীলাম্বরীর মত তারার ফুল-কাটা নীল আকাশের কোলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েচে। স্নিগ্ধমধুর জ্যোৎস্নায় কুশীনগরের শালবন অপরূপ শোভা ধারণ করেচে। কচি কচি লালচে পাতার কোলে গোছা গোছা সাদা ফুল হাওয়ায় নড়ে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়চে মাটিতে। সমস্ত জায়গাটায় যেন ফুলের বিছানা পাতা হয়েচে।

অল্প দূরে মধুর কুলুকুলু ধ্বনি তুলে, হিল্লোলে হিল্লোলে পুষ্পাঞ্জলি বয়ে নিয়ে ছোট পার্ব্বত্য নদী কাকুৎস্থা চলেচে কোন অসীমের সন্ধানে কে জানে?

নদীতীর হতে একটু দূরে তুটি শাল গাছের তলায় বেদী রচনা করা হয়েচে।

মহানির্ব্বাণ লাভের ইচ্ছা করে ভগবান বুদ্ধ এখানে অন্তিম শয্যায়

শয়ন করেচেন। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রকিরণ এসে সে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি আরও উজ্জ্বল করে তুলেচে।

আনন্দ, উপালী, প্রভৃতি শিষ্যগণ ও চিকিৎসক জীবক নীরবে সেই দেবমূর্ত্তি দর্শন করছিলেন।

তথাগতের আসন্ন বিরহে সবচেয়ে কাতর হয়েচেন আনন্দ। খুব তুঃখিত হয়ে তিনি বললেন—"চুন্দের দেওয়া মাংসই ভগবানের দেহান্তের কারণ হলো।"

ধীরে ধীরে বুদ্ধ বললেন—"অমন কথা বলো না, বৎস। জীবনে যত ভিক্ষা পেয়েচি, সুজাতার আর চুন্দের অন্নই তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এরা তুজন আমার পরম উপকারী—সুজাতার অন্ন আমাকে নির্ব্বাণ* দিয়েচে আর চুন্দের অন্ন আমাকে দেবতারও তুর্লভ মহানির্ব্বাণের পথে নিয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে প্রভু বললেন—"আনন্দ, সমস্ত ভিক্ষুদের ডাক, আমার শেষ কথা তোমাদের বলবো।"

আনন্দ সকলকে আহ্বান করলেন।

ধীরমন্থর পদে শিষ্যগণ সেখানে এলেন। কুশীনগরের মল্লবংশীয়দের অনেকেই উপস্থিত হলেন সেখানে। সেদিন সঙ্ঘে নূতন ভিক্ষু হয়েছিলেন সুভদ্র। ইনিই বুদ্ধের শেষ শিষ্য। বুদ্ধের অসুস্থতার জন্যে প্রথমে আনন্দ এঁকে কাছে আসতে দেন নি, কিন্তু বুদ্ধ সুভদ্রকে আসতে অনুমতি দিয়ে নিজে তাঁকে দীক্ষিত করেন।

একে একে অনেকেই সমবেত হলেন সেই বনভূমিতে। ভক্তি ও

---

* সুখ তুঃখের জ্বালা নিবারণ মানেই নির্ব্বাণ বা সম্যক্ সমাধি। আর জন্ম-মৃত্যু-রূপ ভীষণ তুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই হলো মহানির্ব্বাণ বা পরিনির্ব্বাণ।

বিষাদের সে এক অপূর্ব্ব সম্মিলন। সকলেরই মুখে বিষাদের সুগভীর ছায়া, আর হৃদয়ে পবিত্র ভক্তিভাব।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। চারিদিক নীরব—শান্ত।

ধীরে ধীরে ভগবান্ তথাগত সুমধুর স্বরে বললেন—"ভিক্ষুগণ, আমার মহানির্ব্বাণের শুভমুহূর্ত্ত নিকট হয়ে আসচে—সমাধিস্থ হওয়ার আগে তোমাদের শেষ কথা বলচি। শেষবার ধর্ম্মের সারমর্ম্ম তোমাদের জানাচ্চি।

সকলেই ধর্ম্মচক্র শিক্ষা করেচ। তোমরা সকলেই জান, সৃষ্টি স্থিতি আর লয়ের ঘূর্ণীতে পড়ে কোন আদিকাল থেকে জীবকে কী অশেষ দুঃখই না ভোগ করতে হয়! তাদের বার বার জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর অধীন হতে হয়। কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করে তবে এ সবের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং তোমরা এই চারটি মহাসত্য সব সময়ে মনে রেখো—

১। জগতে দুঃখ আছে, ২। দুঃখের কারণ আছে, ৩। দুঃখের শেষ আছে, আর ৪। দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় আছে।

মানুষের জীবন বড়ই দুঃখময়।

রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি নানান্ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় তাকে জন্মের পর থেকেই। কিন্তু যার জন্মই হয় না, এ সব দুঃখভোগও করতে হয় না তাকে। সুতরাং দেখা যাচ্চে—জন্মই সমস্ত দুঃখের কারণ।

পৃথিবীর সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ্, এই সব দেখে মানুষের ভারী ইচ্ছা হয় ঐগুলি পেতে। প্রাণপণ চেষ্টা করে এ সব সে যতই পায়,—পাওয়ার

নেশা যায় ততই বেড়ে। কিছুতেই আর তার আশা মেটে না। এই অতৃপ্ত আশার জন্যেই তাকে বার বার জন্মাতে হয়।

সুতরাং জন্মের মূল কারণ হলো আশা। এই আশাকে দূর করতে পারলেই জন্মমৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।

এখন দেখতে হবে আশার কারণ কি? জগতের বিচিত্র রূপ আর সৌন্দর্য্য দেখে মানুষ ভারী মুগ্ধ হয়,—সে ভাবে, সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায় বুঝি এই সবেরই মধ্যে। এসব যে কত অসার, কত ক্ষণস্থায়ী তা তার মনেই থাকে না। মানুষ ভেবেও দেখে না যে, আজ যা সুন্দর বলে মনে হচ্চে দুদিন পরে তা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। আজ যে ফুলটি সুন্দর হয়ে ফুটে আছে—কাল তা শুকিয়ে ঝরে পড়বে, রূপে ঢল ঢল সুন্দর মুখখানি মৃত্যুর পর হয়ে যাবে গলিত শব। রূপ, ঐশ্বর্য্য, গৌরব কিছুই চিরকাল থাকবে না।

মানুষ এই কথাগুলি ভুলে যায়। রূপ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় বলে সে ভুল করে।

আশার কারণই হচ্চে এই ভুল বা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর করতে পারলেই আশার শেষ। আশা না থাকলে বারংবার জন্মাতে হয় না,—আর জন্ম না হলেই তো ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত হতে নিস্তার পাওয়া যায়।

সব দুঃখের মূল এই ভ্রান্তি হতে নিস্তার পাওয়ার উপায় আটটি—

১। তোমার দৃষ্টি শুদ্ধ কর। ২। সঙ্কল্প শুদ্ধ কর। ৩। শুদ্ধ বাক্য বল। ৪। শুদ্ধ কর্ম্ম কর। ৫। শুদ্ধ উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন

কর। ৬। শুদ্ধ ব্যবহার কর। ৭। শুদ্ধ অভ্যাস কর। আর ৮। শুদ্ধ ধ্যানে চিত্তকে সমাহিত কর।

১। হিংসা করা ২। যা দেওয়া হয় নি তা নেওয়া ৩। মিথ্যা কথা বলা ৪। মিথ্যা বিষয়ে মন দেওয়া ৫। মিছামিছি তর্ক করা ৬। কঠোর হওয়া ৭। নিষ্ঠুর হওয়া ৮। ব্যভিচার করা ৯। মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করা ও ১০। প্রাণী হত্যা করা, এই দশটি কাজ দুঃখদায়ক। তোমরা কখন এসব করো না। এসব কাজ হতে নিবৃত্ত থাকাই 'শীল'। তোমরা সকলে শীল গ্রহণ করো।

ভিক্ষুগণ, তোমরা কখন বিলাসী হয়ো না,—কিংবা দারুণ কঠোরতায় দেহ নিপীড়িত করো না। মধ্যপথই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। মধ্যপথ অবলম্বন করে ঐ আষ্টাঙ্গিক সাধনায় নিযুক্ত হও, তোমাদের সমস্ত অজ্ঞতা, সব আসক্তি দূর হবে। আসক্তি দূর হলেই চরমে মহানির্ব্বাণ লাভ করবে।

ভগবান নীরব হলেন।

ভক্তি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভিক্ষুগণ সমস্বরে গাইলেন—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

নৈশ-নীরবতা ভেদ করে দূরে দূরান্তরে প্রতিধ্বনি উঠলো—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"

আবার বনস্থলী নীরব হলো।

মহানির্ব্বাণের পুণ্যমুহূর্ত্ত সমুপস্থিত। শালবৃক্ষ তলে ভগবান্ অমিতাভ সমাধিস্থ হলেন। সে সমাধি আর ভাঙলো না।

করযোড়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সকলে গাইলেন—"নমো তস্‌স ভগবতো অর্‌হতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।"

সুষুপ্তা ধরণী যেন তন্দ্রাঘোরে গাইল "নির্ব্বাণ", বিমানপথে যেন দেবদুন্দুভি বেজে উঠলো—সমগ্র বিশ্বদেবগণ গাইলেন—"মহানির্ব্বাণ।"

ত্রিংশ

শেষ

শোকপূর্ণ হৃদয়ে ভিক্ষুগণ ধীরে ধীরে এসে ভগবান্ বুদ্ধের চরণে শেষ প্রণাম করলেন, শেষবার সেই পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করলেন, জন্মের মত শেষবার সে দেবমূর্ত্তি দর্শন করলেন।

তারপর চন্দন কাঠের চিতায় সেই পবিত্র দেহ দাহ করা হলো। শাক্য, মল্ল প্রভৃতি রাজবংশের লোকেরা ও দেশ-দেশান্তরের রাজা ও ভিক্ষু সেই চিতাভস্ম ও অস্থি আট ভাগে ভাগ করে নিয়ে তার উপর স্তূপ ও মন্দির তৈরী করে হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন।

রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকল্প, রামগ্রাম, চেঠদীপ, পাবা ও কুশীনগরে ঐ স্মৃতিস্তূপগুলি তৈরী হলো।

ভগবান্ বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের পর সঙ্ঘের সুবিধার জন্যে কাশ্যপ, আনন্দ ও উপালী তাঁর সারগর্ভ উপদেশগুলি লিখে রাখলেন।

তাঁদের লেখায় তিনটি পেটিকা (প্যাটরা বা ঝুড়ি) ভর্ত্তি হয়ে গেল বলে ঐ শাস্ত্রের নাম হলো 'ত্রিপিটক'। এই তিনটি পিটকের নাম—অভিধর্ম্ম-পিটক, সূত্র-পিটক ও বিনয়-পিটক। পরে নিকায়গ্রন্থ, থেরগাথা, অবদানশতক, আরও কত সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

কয়েক শতাব্দী পরে সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে কপিলবস্তু, সারনাথ, বুদ্ধগয়া (সিদ্ধিলাভের স্থান) প্রভৃতি পবিত্র স্থানে সুন্দর সুন্দর মন্দির ও স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও সাধারণের সুবিধার জন্যে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশগুলি বড় বড় পাথরের স্তম্ভে ও পর্ব্বতের গায়ে ক্ষোদিত করান। সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্যে আপনার পুত্র ও কন্যাকে সিংহলে পাঠান। সিংহলের রাজা ভগবান্ বুদ্ধের দন্তমন্দির স্থাপিত করেন।

তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সুমাত্রা, যাভা প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের শিক্ষা প্রচারের জন্যে বড় বড় বিহার নির্ম্মিত হয়েছিল।

কালে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীর লোক এই সুপবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে গেয়েছিল—

"নমো তস্‌স ভগবতো অর্‌হতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।"

আজও ভারতের ভক্তপ্রাণ হিন্দুগণ ভগবান্ বিষ্ণুর নবম অবতার বলে বুদ্ধদেবের চরণে নীরব অর্ঘ্য দিয়ে থাকে।